একক ১৪ ❐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

প্রস্তাবনা : রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী। দেশপ্রেমিক মানবদরদী এই কবি সমসাময়িক সমাজ ও বিশ্ব নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। একই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের যুক্তিঋদ্ধ মূল্যায়নও করেছিলেন তিনি। তাঁর চিন্তা পরবর্ত্তী সমাজ বিশ্লেষক ও সমাজবিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছে। এই একক পাঠে আপনারা জানতে পারবেন ÷

১. রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার প্রেক্ষাপট ÷ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিবেশ

২. রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজ ও ব্যক্তিত্বের ধারণা

৩. রবীন্দ্রনাথের সমাজবিশ্লেষণ পদ্ধতি

৪. স্বদেশী সমাজ ÷ আত্মশক্তি ও সমূহ

৫. হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমাধান সন্ধান

৬. জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা

৭. সাম্য প্রতিষ্ঠায় সাম্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কার্যকারিতা

৮. সমবায় নীতি

৯. কৃষি ও শিল্পে বিজ্ঞান ও যন্ত্রের ব্যবহারর সমর্থন

১০. প্রকৃত শিক্ষা ও তার উপযুক্ত সংগঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্ম

১. রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার প্রেক্ষাপট : তাঁর জীবনী ও পরিবেশ

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে অর্থাৎ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের চার বৎসর পর। এই সংগ্রামে ভারতীয়দের ওপর বিদেশী শাসকদের অত্যাচার সত্ত্বেও একটি উল্লেখ্য পরিবর্ত্তন ভারতীয় সমাজের চেতনায় এসেছিল। সেটা হল বহু শতাব্দী পরে ভারতীয়দের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণ এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সাধনের সমবেত প্রচেষ্টার একটা তাগিদ। এরই সঙ্গে মনে রাখা দরকার ঠাকুর পরিবারের উদার আবহাওয়ায় বিলিতি সংস্কৃতির ধারার পাশাপাশি দেশীয় ঐহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার ধারাও প্রবহমানা ছিল। রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর এই সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে। ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তায় দেশজ সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য কিংবা পশ্চিমী সংস্কৃতির নির্বিচার ও দাসসুলভ অনুকরণের কোনোটাই দেখা যায় না। পরিবর্ত্তে তাঁর বিশ্বদৃষ্টিতে বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি উদার মানবতান্ত্রিক মনোভাবের পাশাপাশি ভারতের মহান ঔপনিষদ অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য সৃষ্টিতে ভারতের মর্মবাণীর সার্থক অনুরণনের

মাধ্যমেই তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার পান। বাঙালি তথা ভারতবাসী বিশ্বসভায় মর্যাদার আসন লাভ করে তাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান কটি পর্যায়

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, গল্পকার, প্রবন্ধলেখক, নট ও নাট্যকার, গীতিকার ও গায়ক, চিত্রশিল্পী রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী, শিক্ষাবিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠান নির্মাতা সংগঠক। তিনি বিভিন্ন মহাদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রভূত। বিশ্বের নানান সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

তাঁর চিন্তাকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে তার জীবনকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম পর্যায় ১৯০০ সনের আগে পর্যন্ত ঃ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্মিলিত প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে ধনীগৃহের যৌথ পরিবারের মধ্যে। শৈশবে মাতাপিতার স্নেহ ও প্রত্যক্ষ সাহচর্যের অভাব অনুভব করার জন্যই হয়ত পরবর্ত্তীকালে বৃহৎ পরিবারের মাঝে মাঝে সমালোচনা করেছেন তিনি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাবাহিকতাও তাঁর জীবনে ছিল না। পরিণত বয়সে তিনি কখনও শিক্ষক, কখনও প্রতিষ্ঠান, কখনও পাঠ্যপুস্তকে দায়ী করেছেন তাঁর স্কুলের পাঠ শেষ না করতে পারার জন্য। কিন্তু এই খেদের জন্যই তিনি শিশুস্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে সজীব ও আকর্ষক করে তোলার ওপর জোর দেন। এবং নিজের স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেই লক্ষ্যে পরিচালনা করেন। বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর জ্ঞানার্জনের কোনও ত্রুটিই হয়নি। ইংরাজী সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যের সাথে তাঁর নিবিড় পরিচয় হয়। দেশজ ও পশ্চিমী শিক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ঠাকুর বাড়ির পরিবেশে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও অঙ্কন বিষয়েও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলেতে গেলেও পাঠ সমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে আসেন পিতার আদেশে। কৈশোর থেকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মূলতঃ সাহিত্যচর্চায় মগ্ন থাকেন যার কেন্দ্রে ছিল কবিতা নিয়ে নানান সৃষ্টি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পিতার আদেশে তিনি বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী দেখতে গিয়ে তিনি একদিকে পল্লীপ্রকৃতির বিচিত্রসুন্দর পরিবেশ থেকে তাঁর সাহিত্য রচনার প্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করেন। অন্যদিকে গ্রাম সমাজের সার্বিক উদ্যোগহীনতা ও আত্মশক্তির অভাব এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশাও প্রত্যক্ষ করেন। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা তথা বিশ্বের অবস্থা নিয়ে তাঁর মনে আলোড়ন চলছিল বহুদিন ধরেই যদিও তার স্পষ্টরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরেই।

দ্বিতীয় পর্যায় ১৯০১-১৯১০ : স্বদেশপ্রেম

১৯০১ থেকে তাঁর জীবন স্বদেশ প্রেমের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন — নেতৃত্বও দেন তিনি এই স্বাধীনতা আন্দোলনের (১৯০৫-১০) শুরুর দিকে। অজস্র লেখা ও বক্তৃতার রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম বলেন যে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সর্বাগ্রে দরকার সামূহিক শক্তির, সামাজিক সংহতির, পুনরুদ্বোধন ও পরিপুষ্টির। বিদেশীশাসনে এই শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সমবায় ও সহযোগিতার

মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে জনগণের আত্মশক্তিকে যদি জাগানো যায় তবেই রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রকৃত অবসান ঘটবে। এই কারণে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনে যা একদিকে পশ্চিমী শিক্ষার যান্ত্রিকতাকে পরিহার করে ব্যক্তিত্বের স্ফূরণে এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য করবে, অন্যদিকে দেশের জনগণের কল্যাণে লাগবে।

তৃতীয় পর্যায় ১৯১১-১৪ : হিংসাশ্রয়ী রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি বিরাগের স্পষ্টীকরণ ও আপন সাহিত্যকৃতির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর বিভিন্ন বিষয় চিন্তাকে সুগ্রথিত করার একটা চেষ্টা দেখা যায়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন ও হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির প্রতি তিনি তাঁর বিরাগ ব্যক্ত করেন। ফলে অপরের বিরাগভাজনও হন তিনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অটল থাকেন তাঁর বিশ্বাসে। সে দেশপ্রেম সমাজের আপামর মানুষের স্বাতন্ত্র্যচেতনা, আত্মবিশ্বাসের ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও সহযোগিতার ওপরে ভিত্তি করে বিশ্বমানবপ্রেম প্রসারিত হয় সেটাই তাঁর চিন্তায় প্রাধান্য পায়। ১৯১৩ সাল 'গীতাঞ্জলি'র (ইংরাজী সংস্করণ) জন্য নোবেল পুরস্কার কবিকে তাঁর মাতৃভাষা এবং দেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয়। কবির কথাও অধিকতর গুরুত্ব লাভ করতে থাকে।

চতুর্থ পর্যায় ১৯১৫-১৯৪১ : দেশপ্রেম থেকে বিশ্বমানবপ্রেম

জীবনের এই পর্বে কখনও বিশ্বভারতীয় জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে, কখনও বা বিভিন্ন দেশের মানুষের প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর দৃষ্টিদেশের সীমা থেকে আন্তর্জাতিক দিগন্তে প্রসারিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় বিচলিত কবি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা দেখান তাঁর Nationalism গ্রন্থে। চীন ভ্রমণের পর তিনি এশিয়ার মানুষের চিন্তা ও ঐতিহ্যের ঐক্যের কথা তুলে ধরেন। 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর যে নতুন পৃথিবী গড়ে উঠেছিল তার বৈশিষ্ট্যের মর্মগ্রাহী বিবরণ দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন। জীবনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে তিনি সৃষ্টিশীল মানবব্যক্তিত্বের গান শুনিয়েছিলেন। স্বার্থান্বেষণে নয়, অপরের সঙ্গে যোগই সৃষ্টিসুখের উল্লাস ও তার চরিতার্থতা সম্ভব। সেজন্যই প্রয়োজন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা। এই সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যুগযুগান্তব্যপী সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতি ও মূল্য বোধের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, যা কিনা ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণের সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত রূপ, পশ্চিমে তথা সমগ্র বিশ্বে প্রবল হয়ে ওঠাতেই বারংবার বিশ্বযুদ্ধের রণহুংকার। এ পথ কল্যাণের পথ নয়। 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ রবীন্দ্রনাথ একথাই বলেছেন। ১৯৪১ সালে তাঁর জীবনাবসানের আগে দুর্মর মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন 'মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ।' মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর সমগ্র চিন্তায় মানুষে সমস্যা উত্তরণের, সঙ্কীর্ণতার বন্ধন ছেদনের ক্ষমতায় এই অপরাজিত বিশ্বাস প্রবল।

২. রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজ (society) ব্যক্তিত্বের (personality) ধারণা-রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তার ভিত্তি আধ্যাত্মিক মানবতন্ত্র

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে এবং ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তাকে পশ্চিমী সমাজ-বিজ্ঞানের বাঁধাধরা ছকের মাধ্যমে হয়ত পুরোপুরি বোঝা যাবে না। তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক মানবতন্ত্রী। তিনি সার্থকভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন রেনেসাঁসধর্মী মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য যার প্রধান কথা হল সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে রয়েছে স্বয়ং মানুষ। গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরুসের উক্তি মানুষ সব কিছুর মূল্যায়নের মাপকাঠি কিংবা বাঙালীর

কবি, চণ্ডীদাসের উক্তি 'সবার উপরে মানুষ সত্য' মানবতন্ত্রের মূল কথা। মানবতন্ত্রে বুদ্ধির চর্চা ও মুক্তির সাধনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে পশ্চিমী রেনেসাঁস প্রণোদিত মানবতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মানুষই মনুষ্যত্বের একমাত্র উৎস। এর পেছনে অন্য কোনও সত্তা বা কল্পিত শক্তি নেই। এই জায়গাতে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন মত পোষণ করেন। উপনিষদের ভাবধারায় পষ্ট রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মনুষ্যসমাজ তথা বিশ্বচরাচর এক কল্যাণকর সত্তার অভিব্যক্তি। সমগ্র সৃষ্টির পেছনে এমন এক চৈতন্যময় সত্তা বা বিশ্বাত্মা বিরাজ করেন যিনি বহু ও বিচিত্র সবকিছুকে সর্বদাই সুসমঞ্জস ও সংগতিপূর্ণ করে তোলেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব বা মানবাত্মা এই পরমসত্তার আংশিক প্রকাশ যা ক্রমাগতই বিকাশশীল।

ব্যক্তিত্ব

রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা অনুসারে মানুষের ব্যক্তিত্ব তার ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের সঙ্কীর্ণতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সমাজের অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার বোধ ও সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে কোনও মানব-ব্যক্তিত্ব বিশ্বব্যাপী পরম সত্তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। মানুষের বক্তিত্বকে বোঝানোর জন্য তাঁর বিখ্যাত **Personality** (1917) **ব্যক্তিত্ব (১৯৬১)** গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'The Second Birth' বা 'দ্বিতীয় জন্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কেমন করে মানুষ প্রকৃতির জগতে জন্মলাভ করে প্রকৃতির জগতের বাইরে আপনার একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে। মানুষ যতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত ততক্ষণ সে গাছপালা ও পশুদের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। মুহূর্তে মানুষ প্রকৃতির অন্ধ অচেতন নিয়মের বাঁধন কাটিয়ে সচেতনভাবে কর্ম শুরু করল অমনি সে রচনা করতে শুরু করল তার নিজস্ব একটি জগৎ — চেতনানিয়ন্ত্রিত কর্মের জগৎ। 'যা-আছে'-র জগৎ থেকে মানুষ চলল উদ্দেশ্যের জগতের দিকে। মানুষের দ্বিতীয় জন্মলাভ হল। বাসনার জগতের সঙ্গে আদর্শের জগতের, যা চাচ্ছে মন তার সঙ্গে মনের যা চাওয়া উচিত, এ দু'য়ের সংঘাত শুরু হল মানুষের মনে। শুরু হয়ে গেল মানুষের জগৎ রচনা। প্রকৃতির বহির্ভূত এই জগতে মানুষ তার ব্যক্তি স্বতন্ত্রতাকে বিশ্বজনীনতার সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ করবার জন্য দুঃসহ সাধনা করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের কথায় "যা আছে ও যা হওয়া উচিত এই নিয়ে মানুষের চেতনার মধ্যে...দ্বৈততা বর্তমান। পশুর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নেই কেননা পশুর মধ্যে বিরোধ যা চাওয়া হয়েছে ও যা চাওয়া উচিত তার মধ্যে। যা চাওয়া হয়েছে, তার অধিষ্ঠান প্রাকৃতিক জীবনে সেখানে আমরা পশুদের সহযাত্রী। কিন্তু যা চাওয়া উচিত, তার অধিষ্ঠান এমন এক জীবনে যা এই জীবন থেকে বহু দূরে। সুতরাং মানুষের দ্বিতীয় জন্ম ঘটেছে।" **(ব্যক্তিত্ব,** সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের Personality গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ; কলিকাতা ÷ বিশ্বভারতী ১৯৬১, পৃঃ ৬৬)। পশুজীবনের অভ্যাস ও প্রবৃত্তির সঙ্গে মানুষের দ্বিতীয় জন্মের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধ মেটানোর জন্য মানুষ নিজের মধ্যে সংগ্রাম করে চলে। "নিজের মধ্যে এই সংগ্রামের আবশ্যকতা মানুষের **ব্যক্তিত্বে একটি নূতন উপাদান যুক্ত করেছে ; তা হল চরিত্র।** আকাঙ্ক্ষার জীবন থেকে এই চরিত্র মানুষকে উদ্দেশ্যের জীবনের পথে পরিচালনা করে। এই জীবন নৈতিক জগতের অন্তর্গত।" (তত্রত্য, পৃঃ ৬৬-৬৭, নিম্নরেখ সংযোজিত)

ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতা

এই নৈতিক জগতের ভিত্তি হল আত্মত্যাগ, আত্মসুখের চরিতার্থতা বা স্বার্থসিদ্ধি নয়। "সর্ব যুগের ও দেশের সংখ্যাতীত ব্যক্তি-মানুষের আত্মত্যাগের উপর এই জগতের ভিত্তি গড়ে উঠেছে।" (তত্রত্য, পৃঃ ৬৭) এটাই হল

মানুষের দ্বিতীয় জন্মের জগৎ ; অতিপ্রাকৃত জগৎ। "এখানে পশুজীবন ও নৈতিক জীবনের দ্বৈততা মানুষ হিসেবে আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলে।" (তদেব)। নৈতিক জগতের সঙ্গে মানুষের জীবনের ত্রুটিহীন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন মানুষ প্রাকৃতিক জগতে বিজ্ঞানের সাহায্যে পদার্থ শক্তিসমূহের পীড়নকে আনুগত্যে পরিণত করার চেষ্টায় রত। "কিন্তু নৈতিক জগতে মানুষকে কঠিনতর কর্ম সাধন করতে হচ্ছে। মানুষকে তার নিজের প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের পীড়নকে আনুগত্যে, পরিণত করতে হচ্ছে। আর সর্বকালে ও সর্ব ঋতুতে মানুষের বিরামহীন সাধনা এই উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হচ্ছে। আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানই এই সাধনার ফল।" (তদেব)।

পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীদের থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্রতা

পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীদের অন্যতম এমিল দুরখাইম বলেছেন সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তি হচ্ছে morality বা নীতিবোধ। ব্যক্তিগত সুখান্বেষণ-ভিত্তিক হিতবাদের দ্বারা সমাজের প্রকৃতি ও অস্তিত্ব ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিমনের বাইরে অবস্থিত ব্যক্তির চিন্তা ও আচরণের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসেবে দেখেছেন। ব্যক্তিত্বের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে নৈতিক জগতের সৃষ্টির সম্পর্ককে তিনি সম্যক বোঝাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সম্পর্কের ভিত্তি বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা নয়, মহত্তর উদ্দেশ্যে এই বন্ধন থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা। এর ভিত্তি প্রাথমিকভাবে সামগ্রিক কল্যাণবোধ, কিন্তু পরিণামে সকল বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণমুক্তির অভীপ্সা। "অন্তরের মুক্তি হল স্বার্থ-সাধনের সংকীর্ণতার থেকে মুক্তি।" (তত্রত্য, পৃঃ ৬৮)। যখন ইচ্ছাশক্তি বাধামুক্ত ও সৎ হয়, অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে সর্বমানবে ও সর্বকালে প্রসারিত হয়, তখন তা মানুষের নৈতিক জগৎকে অতিক্রম করে আর এক জগতের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করে।" (তদেব)

এমিল দুরখাইম ও মাক্স হ্বেবারের সমাজ বিশ্লেষণে মানুষের ইহজাগতিক বিচারবুদ্ধি ব্যতিরেকে অন্য কোনও কিছুর, যেমন কোনও পরম সত্তার, ধারণার সাহায্য নেওয়া সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার দুর্বলতারূপেই প্রতীয়মান হয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কোনও সমাজের তথা বিশ্বসমাজের পরিবর্তনের দিশা নির্ণয়ের জন্য ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকের সম্মিলন

ব্যক্তিত্বের জগৎ গ্রন্থে (The world of Personality) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টাই ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "আমাদের আত্মোপলব্ধির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে। নৈতিক দিকে রয়েছে স্বার্থহীনতার শিক্ষা, আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণ ; আধ্যাত্মিক দিকে রয়েছে সহানুভূতি ও ভালোবাসা। এদের একত্রে গ্রহণ করা উচিত ; কখনো স্বতন্ত্রভাবে দেখা উচিত নয়। কেবলমাত্র আমাদের প্রকৃতির নৈতিক দিকের চর্চা হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও কাঠিন্যের রাজ্যে আমাদের নিয়ে যায়, নিয়ে যায় ভালোত্বের অসহ্য দম্ভের পথে। আর কেবল আধ্যাত্মিক দিকের চর্চা আমাদের নিয়ে যায় কল্পনার অসংযমের অন্ধকার-তার আমোদের ক্ষেত্রে" (তত্রত্য, পৃঃ ৫৮)।

আধ্যাত্মিক দিক ও নৈতিক দিক দুটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মি দিকের উৎস বিশ্বব্যাপী বিরাজমান ঈশ্বরের সঙ্গে মানবহৃদয়ের একাত্ম হবার অভীপ্সা। সর্বেশ্বরবাদী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন ও এক। তাঁর কথায় "দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন।....এই সংসারই

তাঁর চিরন্তন মন্দির। এই সজীবন সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে।" তাই সংসার জীবনের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে সংসারকে উপভোগ করাই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ, সংসারকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা নয়। ব্যক্তিত্বের মূল সব কিছুতে বর্তমান এক সজীব সত্তা বা আত্মা। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের মতে জগৎ চরাচরের গভীরে আত্মার অবস্থান-কল্পনা সভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতের একটি অনন্য অবদান। সকল কিছুতেই আত্মার অবস্থান সম্পর্কে এই প্রত্যয় তাঁকে উপনিষদ চিন্তা থেকে আধুনিক জড় বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পর্যন্ত অনুসরণ করেছে। বৃক্ষের মর্মর স্বর, নদীর কলতান, পর্বতমালার গম্ভীর সৌন্দর্য ও বিহঙ্গের সঙ্গীতের মধ্যে সেই পরমসত্তার সৃষ্টিশীল সামঞ্জস্য বিধানের আনন্দময় প্রকাশ। ব্যক্তিত্ব সেই আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়েই অনন্তের সত্তাকে উপলব্ধি করে এবং নব নব সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করে। "বক্তিত্বে স্পর্শের এই উপলব্ধি মানুষের হৃদয়ে এক কেন্দ্রোপসারী ঝোঁক সৃষ্টি করেছে যার ফলে মানবহৃদয় এক বিরামহীন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সংগীতে চিত্রে কাব্যে, মূর্তিতে উজাড় করে দেয় আপন সৃষ্টিতে। আর কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি মানুষকে আকর্ষণ করেছে নানা গোষ্ঠী, নিজেকে উজাড় করে দেয় আপন সৃষ্টিতে। আর কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি মানুষকে আকর্ষণ করেছে নানা গোষ্ঠী, গোত্র ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনে।" (তদেব ; পৃঃ ৫৯)। কিন্তু ভূমি কর্ষণ, বস্ত্র বয়ন সন্তানদের লালনপালন, সম্পদের জন্য শ্রম ও শক্তির জন্য সংগ্রাম করার সময়ে মানুষ একথা ঘোষণা করতে কখনও ভোলে নি যে সে তার জগতের অন্তস্তলে মৃত্যুঞ্জয় পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব তাই নৈরাশ্য ও বেদনার দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েও বিনষ্ট হয় না, সে পরমপুরুষের স্পর্শ অনুভব করতে চায়।

সমাজ-একাধারে ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের উৎস ও সৃষ্টি

সমাজের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, মানুষের আত্মোপলব্ধি হয়। নিজেকে সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে মানুষ সর্বমানবের মধ্যে ক্রিয়াশীল বিশ্বসত্তার সাথে এক নিগূঢ় ঐক্য অনুভব করে। "মানুষের এই উপলব্ধি ও চরিতার্থতার জন্য সর্বোত্তম উপায় মানুষের সমাজ। এই সমাজ মানুষের সম্মিলিত সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে মানুষের সামাজিক সত্তা নিজেকে সত্য ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে আবিষ্কারের চেষ্টা করে। ....সামাজিক ঐক্য ও আত্মীয়তার এই বৃহত্তর জীবনে মানুষ অনুভব করে ঐক্যের রহস্য, যেমনটি সে করে সঙ্গীতের মধ্যে।" ''[For man, the best opportunity for such a realization has been in man's society. It is a collective creation of lies, through which his social being tries to find itself in its truth and beauty....In this large life of social communion man feels mystery of unity, as he does in music." (Creative Unity. Madras Macmillan, 1988 (1922) pp. 21-22)]

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজকেই অধিক প্রামান্য দিয়েছেন এবং আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় সমাজকে জৈব (organic) প্রত্যয়ে বিচার করেছেন। মানুষের দুটি মুখ্য প্রবণতা তিনি লক্ষ্য করেছেন ÷ একটি আত্মতৃপ্তি এবং অপরটি আত্মোন্নতি। মানুষ বিষয়সম্পত্তিতে সুখের সন্ধান করে আত্মকেন্দ্রিক জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে আরেকটি বৃত্তিও ক্রিয়াশীল সেটা হল সকলের শুভকামনা ও মঙ্গলচিন্তা। আবার বংশ ও জাতি রক্ষার জন্য এই পরার্থপরতার উৎস হল সহজাত জৈব প্রবৃত্তি। মনুষ্যপ্রকৃতির এই দ্বিবিধ ধারার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের একটি বৃহত্তর শরীর রয়েছে, সেটা হল সমাজ শরীর। সমাজ হল একটা জৈব সত্তা যার অংশ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আছে। আমরা আমাদের নিজ নিজ সুখ চাই, যা খুশী তাই করতে চাই। আমাদের প্রত্যেকে অন্য বক্তিকে দিতে চাই কম অথচ অন্যের থেকে পেতে চাই বেশী। এই কারণে সামাজিক জীবনে ঝগড়াঝাঁটি ও লড়াই দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অন্যতর ইচ্ছাও বর্ত্তমান, যা আমাদের সামাজিক সত্তার গভীরে কাজ করে যায়। এটা হচ্ছে সমাজের কল্যাণ কামনা।" [We have a greater body

which is the social body. Society is the organism, of which we as parts have our individual wishes. We want our own pleasure and license. We want to pay less and gain more than anybody else. This causes seramflings and fights. But there is that other wish in us which does its work in the depths of social being. It is the wish for the welfare of the society'' **(sadhana,** Madras : Macmillan, 1988 (1913), p. 68).

সমাজের প্রয়োজন মানুষের স্বভাবগত। মানুষর শুভ ও সুন্দর বোধের উৎস হল সমাজ। সামাজিক কাঠামোয় মানুষ বুদ্ধি ও বিবেককে সংযুক্ত করে এবং সেই কাঠামোটি সমাজের সভ্যদের পারস্পরিক চিন্তা ও অনুভূতির সাযুজ্য রক্ষা করে। মানুষের অহংভাবকে সমাজই অতিক্রম করে এবং তার প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করে। সমাজের মধ্য দিয়েই সকল মানুষের মিলন ঘটে। রবীন্দ্রনাথের মতে, ''সমাজের নিজের কোনও দূরবর্ত্তী উদ্দেশ্য নেই। সমাজ নিজেই একটি উদ্দেশ্য। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ হল সমাজ। সমাজ মানবিক সম্পর্কের সেই স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ যার সাহায্যে ব্যক্তিরা পারস্পরিক সহযোগিতার পথে তাদের জীবনাদর্শের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এর একটি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক দিকও আছে, কিন্তু সেটি কেবল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সম্পর্কিত তা হল নিজেকে টিকিয়ে রাখা। এই দিকটি শক্তি বা ক্ষমতার দিক, মানবিক আদর্শের নয়। এবং শুরুতে এই ক্ষমতার পৃথক একটি জায়গা ছিল সমাজে এবং সেটি বিশেষ বৃত্তির লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।" [Society as such has no ulterior purpose. It is an end itself. It is a spontaneous self-expression of man as a social being. It is a natural regulation of human relationships, so that men can develop ideals of life in co-operation with one another. It has also a political side, but this is only for a special purpose. It is for self preservation. It is merely the side of power, not of human ideals. And in the early days it has its separate place in society, restricted to the professionals. (Nationalism; Madras : Macmillan 1985 p.5).

সমাজ ও রাষ্ট্র বা নেশন-স্টেট

রবীন্দ্রনাথ সমাজকে রাষ্ট্রের চেয়ে বড় বলে মনে করতেন। সামাজিক ঐক্যকে রাষ্ট্রিক বা ন্যশনাল ঐক্যের চেয়ে মহত্তর বলে মনে করতেন। ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এবং তার একটা বিশিষ্টতাও লক্ষণীয়। এই জাতীয়তাবাদের ভাবধারা ইউরোপীয় প্রায় নেশন বা ন্যাশনালিজমের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে ইউরোপীয়দের এবং ভারতীয়দের ঐক্যের ধারণা একরকম নয়, কিন্তু তাই বলে ভারতীয়দের মধ্যে যে ঐক্য নেই তা বলা ঠিক হবে না। 'সে ঐক্যকে ন্যাশনাল না বলিতে পার কারণ নেশন এবং ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে, ইউরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।" ('ভারতবর্ষীয় সমাজ' **রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১২, পৃঃ ৬৭৯। 'নেশন কী' তত্রত্য, ৬৭৫-৬৭৮)। ন্যাশনাল ঐক্যের অর্থ ''রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্য"। (তত্রত্য পৃঃ ৬৭৯)।

বিচিত্রকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ অন্যতম মানদণ্ড বলে বিবেচনা করেছিলেন। ইউরোপে ঐক্য অর্জিত হয়েছে নেশন স্টেট বা রাষ্ট্রের মাধ্যমে। তাই ইউরোপে রাষ্ট্রতান্ত্রিক ঐক্যই শ্রেয়। ভারত বিচিত্রকে একত্র করেছে সমাজের সূত্রে। নেশনের মধ্য দিয়ে ইউরোপ যাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে তারা সবর্ণ, ভারত যাদের একসূত্রে বেঁধেছে তারা কিন্তু অসবর্ণ। ভারতীয় সভ্যতার এটাই বৈশিষ্ট্য যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও এক সমাজবন্ধন স্বীকার করে নিয়েছে। এটা কখনই বাহুবল বা অস্ত্রশক্তি প্রয়োগের ফলে হয়নি। এর ভিত্তি ভারতীয় সমাজের সদস্যদের অতীত কাল থেকে মিলনের জন্য, সামূহিক কল্যাণের জন্য,

অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ করার প্রস্তুতি ও তৎপরতার জন্য। রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যপ্রচেষ্টা উপেক্ষনীয় নয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজে ঐক্যের দৃঢ়তার জন্য এই রাষ্ট্রতান্ত্রিক ঐক্য যথেষ্ট নয়। এই ঐক্যের জন্য প্রয়োজন সামাজিক ঐক্য। "আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো।" অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। ঐক্য বিধায়কদের শক্তিসংগ্রহ ও শক্তিপ্রয়োগই তার শক্তি। আর নেশন স্টেটই তাদের আশ্রয় বলে নেশন স্টেটসমূহের অধিবাসীরা নিজ নিজ নেশন স্টেটের শক্তিবৃদ্ধির জন্য অপরাপর নেশন স্টেটের ওপর, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেছে। তাই "য়ুরোপের নেশনতন্ত্রে এই স্বার্থ বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। ...আগে আমার নেশন তার পরে বাকি আর সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে।" ('বিরোধমূলক, আদেশ', তত্রত্য, পৃঃ ৮৮৪)। 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেছেন যে জাতীয়তাবাদ মানুষকে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন ও তার মনুষ্যত্বকে অবরুদ্ধ করে। এই কারণে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন আমাদের ঐতিহ্যে ন্যাশনালিজম বা রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের ধারণা ছিল না বলে আমাদের লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। কেননা এই ঐতিহ্য সমাজভিত্তিক ঐক্যের দ্বারা বিধৃত। আর এই ঐক্য আপন সুখ বিধানের ও স্বার্থসাধনের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, এর ভিত্তিভূমি অপরের ব্যক্তিত্বের ও অন্য জনসমষ্টির স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নেওয়ার ক্ষমতা এবং অপরের কল্যাণের জন্য নিজেদের সংকীর্ণ সুখভোগৈষণা বিসর্জন দেওয়ার চিন্তা ও কর্ম। এরই জন্য ভারতীয় সমাজ বিচিত্রের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হতে পেরেছে এবং বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। এই জন্যই ভারতীয় সমাজের আদর্শ যেমন একদিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য বিকাশের পথে উন্মুক্ত রেখেছে তেমনই বিশ্বমানবের মিলনের সম্ভাবনাও অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। কিন্তু ন্যাশনালিজম্-এ এই সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। ন্যাশনালিজমের প্রতিষ্ঠা নেশন বা কাল্পনিক এক সমষ্টির কাছে ব্যক্তিকে বলি দিয়ে মানুষের সৃষ্টিশীল সত্তার বিকাশকে ব্যাহত করে। অন্যদিকে একটি বিশেষ নেশন তার স্বার্থরক্ষায় অন্য একটি নেশনের উৎসাদনে পশ্চাৎপদ নয়। ভারতীয় সমাজ জীবনের আদর্শ কিন্তু সংঘাতের মধ্য দিয়ে অপরের বিনাশ নয় ; তার আদর্শ সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অপরকে আপন করে নেওয়া। এবং সেজন্য ভারতীয় জীবনের আদর্শ বিশ্বকে পথ দেখাবে। বিবেকানন্দের মত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও ভারতীয় ঐতিহ্যের ও ভারতের সমাজ আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে। আবার বিবেকানন্দের মতই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেশের সমাজের দুর্বলতাগুলির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ একটি যুক্তি নির্ভর সমাজ বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ও শেষ পরিচয় ছিল তিনি আন্তরিকভাবে একজন কবি এবং সাহিত্যিক। তাঁর সত্যানুসন্ধান ও সত্যদর্শনের পথ সমাজ বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এই পার্থক্যের স্বরূপ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্যে সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ একবার মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' পাঠ করেন যেখানে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যে ব্যক্তি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণবোধ এবং রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে সম্পর্কটির সুনিপুণ বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে গুরুদাসবাবু বলেন, "কোনো ব্যক্তি একটি দেশ গজকাঠি লইয়া মাপিতে যান। প্রত্যেকটি স্থান, তাহার ভৌগোলিক সংস্থান, ইতিহাস প্রভৃতি তাঁহার নক্সায় পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। ইনি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র তত্ত্বের দিকে না যাইয়া হয়ত একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিসংকেতে দূর হইতে দেখাইয়া দেন, সেই আভাসে সমগ্র দেশটির একটি সংক্ষিপ্ত ও জীবন্ত চিত্র দর্শকের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইনি কবি। বৈজ্ঞানিক যেরূপভাবে আমাদের অভাব অভিযোগের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কথা বলিয়া উপায়গুলির ক্ষুদ্রতম

বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতেন রবীন্দ্রনাথ তাহা না করিয়া তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার সংকেতে যেন একটি চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা বিদেশমুখী ছিলাম, স্বদেশমুখী হইব।" (**আত্মশক্তি ও সমূহ রবীন্দ্ররচনাবলী খণ্ড ১২**, পৃঃ ৭৬৯)। দৃষ্টিভঙ্গী (macroview) থেকে ভারতবর্ষের সমাজ তথা মানবসমাজ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস তথা বিশ্বের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছিলেন যা থেকে আমরা সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাই। অবশ্যই পল্লীসমাজ সম্বন্ধে, দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধাবলীতে, দেশের মানুষ ও মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর উপন্যাস, বিশেষতঃ ছোট গল্পে, বাস্তবজীবন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ ও সংবেদনশীল অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য আহরণ ও তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পেশ না করতে পারলেও সমাজ ও তার সংস্কৃতি যথার্থভাবে বোঝার জন্য বাস্তবজীবন সম্পর্কে মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে বিশদ তথ্য সংগ্রহ এবং তার বিজ্ঞান সম্মত বিচার বিশ্লেষণের গুরুত্ব সম্পর্কে তরুণ সমাজকে অবহিত করেছিলেন। যথার্থ সমাজ-বিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানের ভিত্তি কী হওয়া উচিত এবং তার ফল কী হতে পারে তার সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বিচার ব্যক্ত করেছিলেন তিনি।

ভারতে সমাজবিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের বিপুল সম্ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থা বৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক ও অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে **সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান** আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূর দেশের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বই পড়িয়া কখনো হইতেই পারে না।" ('ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', **রবীন্দ্ররচনাবলী,** পঃ বঃ সরকার, খণ্ড ১২, পৃঃ ৭২৭, নিম্নরেখ সংযোজিত)। বিচিত্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, আচার ব্যবহারের প্রকৃতি অনুধাবন করে, তাদের তুলনা করে তাদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের সাধারণ ধর্ম যে মানব ঐক্য সেটাকে প্রস্ফুটিত করাই সমাজবিজ্ঞানের কাজ। আর সে কাজের জন্য ভারতবর্ষ উপযুক্ত ক্ষেত্র।

সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের চাই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ

রবীন্দ্রনাথ নিজে যদিও তত্ত্বদর্শী ছিলেন, সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি পুঁথিগত বা পুঁথি থেকে আহৃত তত্ত্বকে যথেষ্ট বলে মনে করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যায় আবদ্ধ তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণী মনে করে যে দেশের সাধারণ মানুষ প্রথাবদ্ধ জীবনে আটকে আছে। তাদের জীবনে নিঃশব্দে যে পরিবর্ত্তন ঘটে যাচ্ছে তা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং তার ফলে তারা দেশের পরিবর্ত্তনের গতি ও অভিমুখ বুঝতে পারে না। দেশ ও সমাজকে বুঝতে সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের (mutural relationship) ও মিথষ্ক্রিয়া (interaction)র প্রকৃতি বুঝতে হবে। এবং এটা করার জন্য তাদের কাছে যেতে হবে। বস্তুতঃ মানুষের কাছে গিয়ে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে জানার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়াটি সজীব ও আকর্ষক হয়ে ওঠে অনুসন্ধানকারীর কাছে। "দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না — যেখানেই হোক না কেন মানবসাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে। পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে ; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে।" (তত্রব্য, পৃঃ ৭২৯)। সাহিত্য পরিষদ-এর মত সংস্থাগুলি যদি ছাত্র-ছাত্রীদের, তরুণ-তরুণীদের নিজের নিজের অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে ক্রিয়াশীল ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির বিবরণ সংগ্রহ করে আনতে উৎসাহ দেন তাহলে এই কাজ করতে

গিয়ে তারা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও কাজকর্মের প্রতি যথোচিত নজর দেওয়ার শিক্ষাও লাভ করবেন এবং দেশের কাজও করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করছেন এই সাধারণ জীবনের একেবারে কাছে গিয়ে, তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের ছাত্রদের মধ্যেও বিরল। তারই ফলে সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-বিষাদ অজানাই থেকে যায় শিক্ষিত জনের কাছে। তিনি দুঃখ করে বলেছেন "আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnollogy র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ **আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাতের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে** পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি (তদেব)। সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের উৎস সমাজ জীবনের শরিক খেটে-খাওয়া মানুষের বাস্তব জীবন। যদি তাদের একেবারে কাছে চলে যাওয়া যায় তাহলে সমাজ জীবন সম্বন্ধে উৎসুক্য বৃদ্ধিই পাবে। "আমাদের ছাত্রগণ যদি তাহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে ক্ষেত্রনিরীক্ষণ নির্ভর পদ্ধতির যে গুরুত্ব আজ সকলেই স্বীকার করেন তার প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন তাঁর লেখায়। উদাহরণস্বরূপ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত বিবিধ উপভাষা, আচরিত নানা ব্রতপার্বণ, বিচিত্র সামাজিক প্রথা, গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলোনো ছড়া, প্রচলিত গান এর কথা বলেছেন তিনি। এই সব বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকলে দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয় আর সেই জ্ঞানের জন্য ক্ষেত্র নিরীক্ষার প্রয়োজন।

বাস্তব জীবনের পক্ষে এই ধরণের তথ্য প্রচেষ্টার অন্য এক গুরুত্বের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এর মাধ্যমে অনুসন্ধানকারীর সাথে সাথে যাদের জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তারাও শিক্ষিত হয়। **রাশিয়ার চিঠি**-তে তিনি সেদেশে সর্বত্র পরিব্যপ্ত "region study অর্থাৎ স্থানিক তথ্যসন্ধানের উদ্যোগ" এর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়ে এরকম হাজার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এবং তার সদস্যসংখ্যা সত্তর হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। "এই সব কেন্দ্রে তত্তৎ স্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়। তা ছাড়া সে-সব জায়গায় উৎপাদিকা শক্তি কিরকম শ্রেণীর, কিম্বা খনিজ পদার্থ সেখান প্রচ্ছন্ন আছে কিনা তার খোঁজ হয়ে থাকে। এই-সব কেন্দ্রের সঙ্গে যে-সব ম্যুজিয়ম আছে তারই যোগে সাধারণের শিক্ষা-বিস্তার একটা গুরুতর কর্তব্য।" সোভিয়েট রাষ্ট্রে জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন "এই স্থানিক চর্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তার একটা প্রধান প্রণালী।"

(**রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১০, পৃঃ ৭০০)। তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে কালীমোহনবাবু এইরকম নিকটবর্ত্তী স্থানের তথ্যানুসন্থান শুরু করেছিলেন, "কিন্তু এই কাজের সঙ্গে... ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের তাতে কোনো উপকার হয় নি।" তবুও **"সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করা মন তৈরি করা কম কথা নয়।** কলেজ-বিভাগের ইকনমিক্স্ ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এইরকম চর্চার পত্তন করেছেন শুনেছিলুম ; কিন্তু এ কাজটা আরো বেশি সাধারণভাবে করা দরকার..." (তদেব, নিম্নরেখ সংযোজিত)। বস্তুতঃ "বিজ্ঞানশিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে।" রাশিয়ার বড় বড় শহর থেকে পল্লীগ্রাম পর্যন্ত বিবিধ

বিষয়ে ম্যুজিয়মের সাহায্যে বই পড়ার বিদ্যা চোখে দেখার অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে দেশের মানুষকে জানা

চোখে দেখে শেখার আর একটা প্রণালী হচ্ছে ভ্রমণ। "ভারতবর্ষ এত বড়ো দেশ, সকল বিষয়েই তার বৈচিত্র্য এত বেশী যে তাকে সম্পুর্ণ করে উপলব্ধি করা হন্টারের গেজেটিয়র পড়ে হতে পারে না। একসময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল— আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার এই ছিল উপায়। (তত্রত্য, পৃঃ ৭০৮) রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে আধুনিককালে দেশভ্রমণের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করেছেন। এর দ্বারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে ছাত্রছাত্রীরা। পুঁথিগত বিদ্যার সাথে চোখে দেখা বাস্তবকে মিলিয়ে নিজেদের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ করবে তারা। ভ্রমণকালে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করে দেশের জনগণ ও সমাজের বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ বিশ্লেষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল

১) সমাজকে ও সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য মানুষের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে লোকের আচার ব্যবহারকে বাইরে থেকে দেখলেই চলবে না তাদের অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাথে সহানুভূতি বা এমপ্যাথিরও আশ্রয় নিতে হবে।

২) লোকসংস্কৃতির পরম্পরার নানা নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তন্নিষ্ঠ অধ্যয়ন করতে হবে।

৩) সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা গড়ে তুলতে হবে। কোন একটি গ্রাম বা অঞ্চলকে সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

৪) দেশের এক অংশের সাথে আর এক অংশের তুলনা করার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির যথাযথ বিকাশ প্রয়োজন।

৫) সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থবুদ্ধি ও সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে মানুষ কী করে সমগ্র বিশ্বের সাথে যোগ স্থাপন করছে ও করতে পার তা অনুধাবন করতে হবে।

৬) ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে কিন্তু অন্ধ আনুগত্য নয়। সমাজ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত মন নিয়ে তার সমালোচনা প্রয়োজন।

৫. স্বদেশী সমাজ : আত্মসক্তি ও সমূহ

রবীন্দ্রনাথের যুক্তি ঋদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর সমসাময়িক সমাজের দুর্দশা ও দুর্গতির কারণ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে বিদেশী শাসনে আমাদের জাতীয় চরিত্রের এক ভয়ানক অবনতি ঘটেছিল। দেশের লোক, গ্রামীণ সমাজ, সমস্তভাবেই বিদেশী সরকারের সাহায্য, করুণা বা অনুদানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এই পরনির্ভরতা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ দেশের মানুষের পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা অসম্ভব।

তিনি বারবার বলেছেন যে, "ইংরাজিতে যাহাতে স্টেট বলে আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু...বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে ; ভারতবর্ষ তাহার আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছে।" (**স্বদেশী সমাজ,** কলিকাতা ÷ বিশ্বভারতী ১৯৬২, পৃঃ ৬)।

দেশের যাঁরা গুরুস্থানীয় ছিলেন তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করতেন। তাঁদের জীবনযাপনের ব্যয় নির্বাহ শুধু রাজা করতেন তা নয়, সমাজের সম্পন্ন প্রত্যেক গৃহীই সাধ্যমত সে কাজ সম্পন্ন করতেন। যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোনও কারণে রাজার সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা বন্ধ হয়ে যেত না। রাজা যেমন জলকষ্ট নিবারণের দিঘী খনন করে দিতেন সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই সেই কাজ করতেন। ফলে জলকষ্ট নিবারণের জন্য দেশের লোককে রাজশক্তির ওপরেই শুধু নির্ভর করে থাকতে হত না। ভারতে "সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে" (তত্রত্য, পৃঃ ৭)। তাই আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়।"

রবীন্দ্রনাথ এটা দেখে বিমর্ষ বোধ করেছিলেন যে ইংরেজ শাসনে ভারতের মর্মে অর্থাৎ সমাজের শক্তিতে প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল। প্রত্যেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার ও অর্থনীতির মোহে সমষ্টির স্বার্থ ভুলে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার জন্য প্রয়াসী হয়েছিল। ফলে গ্রামপ্রধান ভারতে গ্রামসমাজ অবহেলিত হয়ে পড়ছিল। গ্রামগুলিতে যোগ্য লোকের ও আত্মবিশ্বাসের অভাব হয়ে পড়েছিল। সমাজের নানা সমস্যা যেমন শিক্ষার সুযোগের অভাব, জলকষ্ট ইত্যাদির জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছিল। কিন্তু "যে কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে।" (তত্রত্য, পৃঃ ৯)।

রবীন্দ্রনাথ তাই মেলা ও উৎসবের মত দেশজ প্রতিষ্ঠানগুলির যথোচিত সংস্কার ও পুনঃ প্রবর্তনের ওপর জোর দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে কৃষি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তথ্যের সম্প্রচারের জন্য এবং সংগৃহীত অর্থের দ্বারা সমাজকল্যাণ মূলক কাজ নির্বাহ করার উদ্দেশ্যে। "স্বদেশী সমাজ" এর সমস্ত রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাধির কথা বলেছিলেন স্বাধীন ভারতেও সেই ব্যাধির প্রকোপ আমাদের সামূহিক জীপনকে বিপন্ন করেছে। সমস্ত বিষয়েই "সরকার মা-বাপ, আমাদের নিজেদের সমস্যা মেটানোর জন্য আমাদের কিছুই করার নেই" এই মনোভাব সুকৌশলে বিদেশী শাসকরা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল যাতে দেশ চিরকাল তাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। অর্থ ও সম্পদে রিক্ত দরিদ্র ভারতবর্ষে তো এই মনোভাব অধিকতর অবাঞ্ছিত। এই ধরণের পরমুখাপেক্ষিতা সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়। ফলে সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য সাধারণ মানুষেরও যে সাধ্যমত কিছু করার আছে এই বোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভিক্ষা ও অনুদানের উপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার বিস্মৃত হয়। তাদের কর্ত্তব্য বোধও জাগ্রত হয় না। বাইরের সাহায্যের সঙ্গে নিজের সম্মিলিত শক্তি, উদ্যম, প্রচেষ্টাকে যুক্ত করার মাধ্যমেই যে গ্রামীণ জনসমূহের উন্নতি ঘটতে পারে তা রবীন্দ্রনাথের সমাজবিশ্লেষণে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সমূহের আত্মশক্তির বিকাশই তাঁর সমাজজীবনের মুখ্য উপজীব্য ছিল।

৬. হিন্দু মুসলমান বিরোধের সমাধান সন্ধান

রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতাকে অর্থাৎ এক বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলনের অভীপ্সা ও প্রচেষ্টাকে মানবব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। অর্থাৎ মানুষের ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তিনি মনে করতেন "ধর্ম আর

ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুণ আর ছাই। ...মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র" ("কর্তার ইচ্ছায় কম" **রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১৩ পৃঃ ২৩৯)। ধর্ম বলে যে মানুষকে শ্রদ্ধা না করলে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। ধর্মতন্ত্র কিন্তু মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করার নিয়মাবলী নিখুঁত করে বানায় আর হুমকি দেয় এই নিবমাবলী যে মানবে না সে ধর্মভ্রষ্ট হবে। ধর্মতন্ত্রে অযৌক্তিক আচারে, বাধা নিষেধের প্রাবল্য। আমাদে দেশে হিন্দু-মুসলমানদের ভেদাভেদের কারণ দুপক্ষের ধর্মতন্ত্রের বাড়াবাড়ি।

রবীন্দ্রনাথের মতে মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সাথে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল। সেই সময়ে এমন সকল সাধুসন্তের জন্ম হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অনেক মুসলমান ছিলেন যাঁরা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্মবিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে বসেছিলেন। ...আজও ভরতে প্রাণস্রোতের মধ্যে সেই সকল সাধকের অমর বাণী-ধারা প্রবাহিত আছে..." ("বৃহত্তর ভারত", **রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১৩, পৃঃ ৩৫৪)। তারই ফলে "এতদিন গোড়ার দিকে একরকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাৎ মেনেও আমরা পরস্পরের কাছাকাছি ছিলুম। ...কিন্তু এক সময়ে যে কারণেই হোক ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করল।" ("হিন্দু-মুসলমান" **রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১৩, পৃঃ ৩৬৭)। এটা ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের কথা।

খৃষ্টানদের মতই মুসলমানদের "ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই।" হিন্দুজাতিও এক হিসেবে মুসলমানদেরই মত। অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সমর্থক নয় বটে — কিন্তু অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের অহিংস অসহযোগ। "হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন।" (তত্রত্য, পৃঃ ৩৫৭)।

রবীন্দ্রনাথের মতে, একতা মানতেই হবে ধর্মমত ও সমাজরীতির সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের ভালোরকম করে মেলা চাই— সেইটেই আমাদের সাধনার বিষয়। "সঙ্গের দিক ধেকে আজকাল হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা।" তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে, আমাদের মধ্যে মিল হবে। "পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে" (তত্রত্য, পৃঃ ৩৬৭)।

৭. জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা

ভারতীয় সমাজের অধিবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণবোধ ও তার জন্যে বক্তির স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার মত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ফলে এই সামগ্রিক কল্যাণবোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেভাবে বাধা পেয়েছিল সেটাও তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন। এর ফলে সমাজের যে কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল তা সামাজিক উৎপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুপ্রাচীনকালে সামাজিক ঐক্য অক্ষুন্ন রেখে কাজের বিভাগের জাতিবিন্যাসের উৎপত্তি হয়েছিল। আর্য ও দ্রাবিড়দের সংঘর্ষ এড়িয়ে একটা সমন্বয় ও সংহতি সাধনে সেই প্রথা কার্যকর হয়েছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে ঐ প্রথায় ভাঙ্গন ধরেছিল। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল মননের পুষ্টি সাধন, নিক্ষার্থীকে ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা দান করা। কিন্তু কালক্রমে তাঁরা সেই কাজে মৌরসী স্বত্ত্ব কায়েম করলেন। এবং অব্রাহ্মণদের জন্মগতভাবে পদানত করে রাখতে প্রয়াসী হলেন। তাতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটিয়ে ক্ষয়িষ্ণু শ্রেমীবিশেষের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের এবং তার সাথে রাজাদের ওপর দেবত্ব আরোপের নিষ্ফল চেষ্টা হয়। বর্ণাশ্রম তাই ক্রমে হৃদয়হীন ও ক্ষতিকর ব্যবস্থায় পর্যবসিত

হয়েছে। জাতপাতের গোঁড়ামির যুপকাষ্ঠে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ, অনুভূতি ও কর্মক্ষমতাকে বলি দেওয়া হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মুক্তির আস্বাদ গ্রহণে মানুষ তখনই সক্ষম হবে যখন সামাজিক ভেদাভেদ সংকীর্ণতার অবসান হবে। তিনি বলেছেন ÷ "এটা স্পষ্ট যে জাতিভেদের ধারণা (caste idea) সৃষ্টিশীল হতে পারে না ; এটা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানগত। জাতিভেদ প্রথা মানুষকে যান্ত্রিকভাবে একটা ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চায়। এই বন্দোবস্ত ব্যক্তির নেতিবাচক দিকের ওপরে জোর দেয়— সেটা হল তার পৃথকত্ব। এই প্রথা মানুষরে মধ্যে নিহিত সম্পূর্ণ সত্যের পক্ষে হানিকর।" (Creative Unity পৃঃ ৯৬)। জাতপাত ব্যবস্থার সামূহিক বিধিনিষেধ মনুষ্যত্বের বিকাশের প্রতিবন্ধক। এই ব্যবস্থা পরিণামে এতটাই নির্দয় হয়ে পড়ে যে এর থেকে অস্পৃশ্যতার মত নিষ্ঠুর কলঙ্কজনক প্রথার সৃষ্টি হয়।

বেদনার্ত রবীন্দ্রনাথ তাই অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদপ্রথার বিরোধিতায় লিখেছেন ÷ "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।" বংশানুক্রমিক মানমর্যাদার অধিকারের পরিবর্তে মানুষ নির্বিশেষে সর্বজনের সামাজিক সকল সুযোগসুবিধায় সমানাধিকার ব্যক্তিত্ব ও সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

৮. সাম্য প্রতিষ্ঠায় সাম্যবাদীরাষ্ট্রব্যবস্থার কার্যকারিতা

সর্বাঙ্গীন সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তিনি। রাশিয়ার বিপ্লবের মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। পরশ্রমজীবী ও পরিশ্রমজীবীর সংগ্রামে তাঁর সহানুভূতি ছিল স্পষ্টতঃই শেষোক্ত শ্রেণীর অনুকূলে। অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি ও জাতিগত বিদ্বেষবন্ধন থেকে মুক্তির বাণী রুশবিপ্লবে ধ্বনিত হয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক "য়ুরোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। ...সুধার ভাগ কেবল একদলই পাচ্ছে, অধিকাংশই পাচ্ছে না এই নিয়ে অসুখ অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য...।" (রাশিয়ার চিঠি, **রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১০, পৃঃ ৬৯৯)। কিন্তু এই রাশিয়াতেই এক প্রবল ব্যতিক্রম ঘটেছিল। "যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।" (তত্রত্য, পৃঃ ৬৭৯)। রুশ বিপ্লবের পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙ্গার কাজের চেয়েও যেটা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল তা হল ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাগাভাগিকে অস্বীকার করে ঐক্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়ে তোলা। "বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে আছে" (তদেব)।

৯. সমবায় নীতি

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে স্বতন্ত্র সম্পত্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের একটি উপায়। "সাধারণ মানুষের কাছে আপন সম্পত্তি ব্যক্তিরূপের ভাষা— সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়।" অথচ ব্যক্তি গত সম্পতির অবাধ অধিকার ও তার নির্বিচার প্রয়োগ শোষণ, নিষ্ঠুরতা ও হানাহানির কারণ। "এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে— অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্য ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণার বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।" (তত্রত্য, পৃঃ ৬৯০)।

এই মাঝামাঝি পন্থা তিনি দেখেছিলেন সমবায়নীতির মধ্যে। **সমবায় নীতি** নামক পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ে

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই য়ুরোপে আজাকাল কোঅপারেটিভ- প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে"। **(সমবায়নীতি, রবীন্দ্ররচনাবলী,** পৃঃ ৪১৮)। এই কোঅপারেটিভ প্রণালীকেই তিনি আমাদের দেশকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় বলে মনে করেছিলেন। "আজ আমাদের দেশটা যে এমন গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া ছাড়া হইয়া নিজের নিজের দায় একলা বহিতেছি।" (তত্রত্য, পৃঃ ৪১১)। য়ুরোপের গরীবদের জন্য যারা চিন্তা করছিলেন তাঁরা দেখলেন, "অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন।" (তদেব) এই মিলনের পদ্ধতি, সমবায় প্রণালীই, ভারতকে, পৃথিবীর সকল দেশকেই উন্নতির পথ দেখাবে। "এখনকার ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর জিতিতে চায় ঠকাইতে চায়, ধনী আপনার টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়।" এটার প্রতিকার সমবায় নীতির তাৎপর্য উপলব্ধি ও তার বাস্তব রূপায়নে। "সমবায় প্রণালীতে চাতুরী কিম্বা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। **মিলিয়া বড়ো হইবে।"** (তদেব, নিম্নরেখ সংযোজিত)। কেবলমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না রেকে সমবায়নীতিকে সর্বব্যাপী ও সুসংবদ্ধ সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিরূপে কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সর্বক্ষেত্রেই সংঘাতের পরিবর্ত্তে তিনি চেয়েছিলেন সহযোগিতা বিভেদ ও শোষণের পরিবর্ত্তে সমবায়। "শক্তি উদ্ভাবনার জন্যে অহমকিা ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে" বলে মনে হয়েছিল তাঁর। কিন্তু মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিবোধের দ্বারা তা সংযত হবে এবং পরিণামে কল্যাণকর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে এইরকম বিশ্বাস তিনি লালন করেছেন।

১০. বিজ্ঞান ও যন্ত্রের ব্যবহারের সমর্থন

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ! আর কৃষিকর্মের উন্নতিবিধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কৃষিকর্মের দুটি দিক-প্রথম জমির স্বত্বের বন্টন ব্যবস্থা বা জমির মালিকানা এবং দ্বিতীয়টি হল উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদনের কলা কৌশল। প্রথম দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লাঙল যার জমি তার নীতিকে সাবধানতার সঙ্গে রূপায়নের কথা বলেছিলেন। ক্ষুদ্র কৃষকের সার্বিক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতার জন্য তাদের হাতে জমির মালিকানা দেওয়া হলেও ধীরে ধীরে সেগুলি মহাজন ও বড় জোতদারের কুক্ষিগত হয়ে যাবে। এই জন্য তিনি সমবায় প্রথার প্রবর্তনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিকের একটি সুন্দর আলোচনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের "ভূমিলক্ষ্মী" প্রবন্ধে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণেই কৃষি উৎপাদন বাড়ানো দরকার। সাবেকী পদ্ধতিতে সে কাজ সম্ভব নয়। "আজকাল চাষকে মূর্খের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে।" **(রবীন্দ্ররচনাবলী,** খণ্ড ১৩, পৃঃ ৫০৭)। এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাতে কলমে কিছু করে দেখানোর জন্য পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি মার্কিন মুলুকে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য। এই কাজ কৃষক ও কৃষির উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচায়ক। কৃষিকর্মে সমবায় প্রথার সঙ্গেই উন্নত প্রণালীতে উৎপাদনের তিনি সমর্থক ছিলেন। শ্রমের লাঘব ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষির যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন চেয়েছিলেন তিনি। গ্রামীণ সংস্কৃতি, কুটীর শিল্প ও সমবায় প্রণালীতে গুরুত্ব দিলেও ভারী শিল্পোন্নয়নেও তাঁর উৎসাহ ছিল। গান্ধীজির চরকানীতি এবং গ্রামনির্ভর অর্থনীতিকে তিনি সমর্থন জানাতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন,"প্রাচীনকালের গ্রাম্যতার গণ্ডিমধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই।" **(রবীন্দ্ররচনাবলী** খণ্ড ১৩, পৃঃ ৫০৭)।

১১. প্রকৃত শিক্ষা ও তার উপযুক্ত সংগঠন

ভারতে দীর্ঘকালীন যাবতীয় দুর্গতির কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার অভাবকেই দায়ী করেছেন। মানুষের মুক্তির প্রকৃত রূপ হল অবিদ্যা ও অক্ষাত থেকে মুক্তি আর এই মুক্তির জন্য চাই শিক্ষা। মনের বিকাশ, মার্জিত সমাজাচার সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা।

প্রচলিত শিক্ষার সমস্ত কিছু গলদের প্রধান কারণ তা জীবন ও সমাজরে সঙ্গে প্রকৃত অর্থে যুক্ত নয়। তদুপরি বিদ্যালয়ের নিয়মনিগড় ও সিলেবাসের বজ্র আঁটুনি শিশুমনকে রুদ্ধ করা হয়। জনৈক শিক্ষাব্রতীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "বিদ্যালয়ে শিশুকাল থেকে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মননশক্তির সজীবতা হারাই বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজের চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোনকালে সবল হয় না।"

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও সাধারণ ও প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী ভাষা এদেশে অনুপযোগী ও শিক্ষা বিস্তারে অন্তরায় বলে তিনি মনে করতেন।

পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞানকে আয়ত্ব করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু আত্মবিস্মৃত হয়ে অন্ধ অনুকরণ করার চেষ্টাকেও তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন। নানা দেশ ও জাতির মিলন এবং চিন্তার আদানপ্রদানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বভারতীর মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈচিত্র্যময় সত্যের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে মানুষের মনকে জানা। প্রাচ্য সংস্কৃতির ঐক্যগত বিভিন্ন ধারার অধ্যয়ন ও গবেষণার সাহায্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন। প্রাচ্যের এই ঐক্যের দৃষ্টিতে পশ্চিমকে দেখা এবং উভয় গোলার্ধে মানব মনে শান্তি ও স্বাধীন চিন্তার মিলনক্ষেত্র গড়ে তোলা। নিয়নকানুনের বেড়াজাল, থেকে মুক্তি, মুক্ত আকাশের নীচে পড়াশোনা, যাতে শিক্ষার্থীর সাথে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় তার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদান, পরীক্ষার ওপর অনাবশ্যক গুরুত্ব না দেওয়া, লেখাপড়ায় বৈচিত্র্য ও কৌতূহল প্রবণতায় উৎসাহ দেওয়া, ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টিশীল কাজে সহায়তা, বিশ্বজনীন মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদি ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য। শান্তিনিকেতন এর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও বিশ্বভারতীতে তিনি এই শিক্ষাপদ্ধতিকে বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা করেন।

স্বাধীনতার পরে গ্রামীণও সমষ্টি উন্নয়নের যে পরিকল্পনা (community Development Project) নেওয়া হয় তার উদ্ভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ বহূপূর্বেই করেছিলেন তাঁর শ্রীনিকেতন পরীক্ষা কেন্দ্রে। গ্রামীণ সংযোগ, গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরতা, সমবায় প্রথায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উপযোগী শিক্ষার প্রবর্তন এই পরীক্ষানিরীক্ষার মূল কথা ছিল।

উপসংহার

এই এককটি পাঠ করে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও কল্পনাবিলাসী সাহিত্যিক মাত্র ছিলেন না। ভারতীয় সমাজ ও তার বৈচিত্র্যের সুনিপুণ বিশ্লেষণ তাঁর বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে আছে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রভাবে তাঁর মানবতাবাদের একটা আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে। তাঁর মূল কথা হল ব্যক্তিমানুষ কেবল স্বার্থ অন্বেষণ না করে অপরের জন্য বিবেচনা করবে। ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত বিকাশ মানুষের বৈশিষ্ট্য, আর তার জন্য সমাজের প্রয়োজন। বিভিন ধরণের গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বমানবের সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী পরমসত্তার সাথে ব্যক্তিমানুষ মিলিত হবে। তাঁর চিন্তায় দেশের ঐতিহ্যের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধার সাথে পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ দেখা যায়। তাঁর সমাজ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বাস্তব জীবন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ, সমগ্রের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা ও যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বদেশীয় সমাজের আচার সর্বস্বতা, উদ্যোগ হীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতা দূর না করলে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা ও উন্নতি অসম্ভব বলে তিনি মনে করেছেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও জাতিভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদ করতে হলে ধর্মতন্ত্রকে পরিহার করতে হবে। সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্কের জন্য চাই ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সাম্যবাদী ব্যবস্থা। সোভিয়েট রাশিয়ায় তার আংশিক রূপ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি শ্রেণীসংগ্রাম

ও রক্তাক্ত বিপ্লবের বদলে সমবায় প্রণালী ও সমন্বয় এবং সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের পাশাপাশি যন্ত্র, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যববহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, সংকীর্ণতা এবং গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলনের পথ প্রশস্ত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় ঘটে, সেই শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি আজীবন পরীক্ষানিরীক্ষা করে গেছেন।

গ্রন্থ পঞ্জিকা

১. Benerjee, A "Rabindranath Tagore : A Poet's Response to the soceity" in Mukhopodhyay, A. K. **The Bengali Intellectual Tradition** 1979, K.P. Bagchi & co.

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ **রবীন্দ্ররচনাবলী,** ১১শ, ১২শ, ১৩শ খণ্ড। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ÷ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

একক ১৫ ❐ ঘুরিয়ে, বি. সরকার, ধূর্জটি প্রসাদ ও রাধাকমল

গঠন

১৫.১ জী. এস. ঘুরিয়ে
১৫.২ বিনয় কুমার সরকার
১৫.৩ ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১৫.৪ রাধাকমল মুখার্জী

১৫.১ গোবিন্দ সদাশিব ঘুরিয়ে (১৮৯৩-১৯৮৪)

প্রস্তাবনা :

ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পঠন-পাঠন শুরু হলে প্রথম যে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী তার সঙ্গে যুক্ত হন তিনি হলেন গোবিন্দ সদাশিব ঘুরিয়ে বা সংক্ষেপে জি.এস. ঘুরিয়ে। বোম্বে (আজকের মুম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ভাষায় এম.এ. পাশ করার পর ঘুরিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডব্লিউ. এইচ. আর. রিভার্সের কাছে যান সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য। ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞান চর্চা শুরু হবার পর তিনিই প্রথম দেখান কিভাবে ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে ভারততত্ত্ব (Indology) এবং সমাজবিজ্ঞানে (Sociology) এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যায়। এই অংশটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন ÷

১. ঘুরিয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

২. ভারতীয় সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণে সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতির প্রয়োগ

৩. ভারতীয় জাতিভেদপ্রথা ও আত্মীয়তার বিশ্লেষণ

৪. উপজাতিদের সম্বন্ধে আলোচনা

৫. ভারতীয় ধর্মের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

৬. নগর এবং গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা

১.১ ঘুরিয়ে সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে ১৮৯৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে ঘুরিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বম্বে বিশ্বদ্যিলায় থেকে তিনি সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করেন। সংস্কৃত পড়ার সময় মনুস্মৃতি পড়তে গিয়ে ঘুরিয়ে ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান-এর বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং স্কলারশিপ নিয়ে কেমব্রিজে যান নৃবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য। প্রথমে তিনি ডব্লিউ, এইচ. আর. রিভার্স-এর কাছে কাজ করতে শুরু করেন। কিন্তু রিভার্স-এর মৃত্যুর পর তিনি এ.সি. হ্যাডন-এর কাছে তাঁর কাজ শেষ করেন।

কেমব্রিজ থেকে ফেরার পর ঘুরিয়ে কিছুদিন কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁর গবেষণার কাজ করেন। পরে ১৯২৪ সালে তিনি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে রিডার এবং বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। দশ বছর

তিনি ওই বিভাগে প্রফেসর হিসাবে কাজ করেন এবং ওই পদ থেকে তিনি ৬৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমেরিটাস প্রফেসর নিযুক্ত হন। ১৯৮৪ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর ৯০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ৩১টি বই লেখেন এবং বিভিন্ন জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য লেখা প্রকাশ করেন।

সমাজবিজ্ঞানের প্রসারে ঘুরিয়ের অবদান অপরিসীম। ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞানে প্রথম যুগের অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী যেমন এম.এন. শ্রীনিবাস এ. আর দেশাই, ইরাবর্তী কার্ভে, ফে. এম. কাপাদিয়া প্রত্যেকেই ঘুরিয়ের ছাত্র ছিলেন তাছাড়া ১৯৬২ সালে ঘুরিয়ে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান সোসাইটী (Indian Sociological Society) স্থাপন করেন। এবং **সোসিওলজিকাল বুলেটীন** নামক জার্নাল বা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই দুটি মাধ্যমের সাহায্যে ভারতরে সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন।

১.২ ভারতীয় সমাজিক ঘটনার বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতির প্রয়োগ

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকার ফলে ঘুরিয়ে খুব পরিষ্কারভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য-এর ধারাটিকে ধরতে পেরেছিলেন। এর সঙ্গে নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন যুক্ত হওয়াতে তিনি ভারতীয় সমাজের আলোচনাতে ভারততত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে এক মেলবন্ধন ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় সামাজিক প্রতষ্ঠানগুলিকে তিনি ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে জাতিভেদপ্রথা ভারতীয় সমাজে কি কি সামাজিক ক্রিয়া (function) থাকে তা ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন।

ভারতীয় সমাজকে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঘুরিয়ে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি দেখান যে অধিকাংশ ভারতীয় বা হিন্দু সামাজিক প্রতিষ্ঠান দুটি কাজ করে থাকে — (১) সংস্কৃতির আদানপ্রদান (২) এই আদানপ্রদানের মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন (Unity thorugh acculturation)। ভারতবর্ষে বৈদিক আর্যদের উত্থানের পর থেকেই সমস্ত ভারতবর্ষে উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এই ঐক্য ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠতে থাকে এবং এর ফলে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্ত হতে থাকে।

ঘুরিয়ের মতে এই ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণ্য ধারণা এবং মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১.৩ ভারতীয় জাতিভেদপ্রথা ও আত্মীয়তার বিশ্লেষণ

জি.এস. ঘুরিয়ে তাঁর **কাস্ট এ্যাণ্ড রেস ইন ইণ্ডিয়া** (Cast and Race in India) (১৯৩২) গ্রন্থে জাতিভেদ প্রথা ও জাতিগোষ্ঠী বা রেস-কে ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-এর পরিপ্রেক্ষিত থেকে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি জাতিভেদ প্রথার ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও তার ভৌগোলিক প্রসার সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। এর সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটিতে যে পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাও তিনি আলোচনা করেন। বইটির পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি স্বাধীনতা উত্তর ভারতে প্রথাটির মধ্যে যে পরিবর্ত্তন আসে তা দেখান। একজন যুক্তিবাদী সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি জাতিভেদপ্রথার বৈষম্যকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মনে করেছিলেন যে শহরের পরিবেশে এবং শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে নিজ নিজ জাতিকে একধরণের ঐকান্তিক

আনুগত্য জন্মাচ্ছে এবং তাঁর গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি দেখান জাতিভেদ প্রথা কিভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করে অনেক সময় বিচ্ছিন্নতামূলক ক্রিয়া শুরু করেছে। পরবর্ত্তীকালে ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে আত্মীয়তার উপর একটি তুলনামূলক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। জাতিপ্রথা ও আত্মীয়তার তুলনামূলক আলোচনাতে ঘুরিয়ে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন — ১) ভারতবর্ষের জাতি ও আত্মীয় ব্যবস্থার মত অনুরূপ প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সমাজেরও ছিল ; এবং এই জায়গায় ঘুরিয়ে সমাজ শাস্ত্রের আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতির ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ২) অতীতকালে আত্মীয়তার বন্ধন ও জাতিপ্রথা ভারতে ঐক্য স্থাপনে সহায়তা করেছিল। এই দুটি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় সমাজের উদ্ভবের ইতিসে বিভিন্ন সংস্কৃতি ইতিহাস ভাষা বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর (racial and ethinie) মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সহায়তা করেছে।

বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুরাণ ইত্যাদি অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন জাতিপ্রথা কখনই একটি বদ্ধ ব্যবস্থা (closed system) ছিল না। এই ব্যবস্থার মধ্যে সবসময়ই একটা সচলতা ছিল। তিনি ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে একসময় বৈশ্যরা শূদ্র হয়ে গিয়েছিলেন এবং শূদ্ররা বৈশ্যের মর্যাদা পেয়েছিল। ঘুরিয়ে দেখান যে জাতিপ্রথা হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। তিনি জাতিপ্রথার মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন—

i) **গোষ্ঠীভিত্তিক বিভাজন** (Segmental division)

ঘুরিয়ে জাতিপ্রথাকে কতকগুলি গোষ্ঠীর সমষ্টি হিসাবে দেখেছিলেন যে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে ও যেগুলির সদস্যপদ জন্ম থেকেই স্থিরীকৃত হয়ে যায়। এই প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নিজস্ব নিয়ম-কানুন থাকে।

ii) **ক্রমাধিকারতন্ত্র** (Hierarcliy)

প্রত্যেকটি গোষ্ঠী বা জাতি ক্রমাধিকারতন্ত্রের নীতি দ্বারা বিভক্ত থাকে। ক্রমাধিকারিত্বের ফলে সামাজিক কাঠামোয় জাতিগোষ্ঠীগুলি উঁচু-নীচুস্থান অধিকার করে। এই উচ্চাবভোব ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে দেখা যায়। বিশেষ করে যে জাতিগোষ্ঠীরগুলি জাতি কাঠামোয় মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকে তাদের পারস্পরিক সামাজিক স্থান বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়। তবে সারা ভারতেই জাতিকাঠামোয় ব্রাহ্মণদের স্থান সবচেয়ে উপরে এবং অস্পৃশ্যদের সামাজিক অবস্থান সব চেয়ে নীচে থাকে।

iii) **পবিত্রতা ও অপবিত্রতার নিয়ম** (Principles of purity and pollution)

উপরের দুটি বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় যে জাতিগোষ্ঠীগুলি একে অপরের থেকে পৃথক বা দূরে অবস্থিত। এই পৃথকীকরণ বা দূরাবস্থান পবিত্রতা-অপবিত্রতা-র নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়মগুলি স্থির করে দেয় কোন জাতি অন্য কোন জাতি থেকে কী ধরণের খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে প্রত্যেক জাতির সদস্যরা একে অপরের থেকে কাঁচা খাবার অর্থাৎ জল ও নুন এর ব্যবহারে তৈরী খাবার গ্রহণ করতে পারে। তবে উচ্চ জাতির লোকেরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণরা শুধুমাত্র পাকা খাবার অর্থাৎ ঘি দ্বারা রান্না করা ও লবণবর্জিত খারাব নীচু জাতিগোষ্ঠীর থেকে গ্রহণ করতে পারে। তবে কোনও জাতিই অস্পৃশ্যদের থেকে কোনও খাদ্য বা জল পর্যন্ত গ্রহণ করে না।

iv) **বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির সম্প্রদায়গত ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও সুযোগসুবিধা** (Civil and Religious Disabilities and privileges of Different Sections)

ক্রমাধিকারের অন্যতম ফল হল সামাজিক অধিকার ও সুযোগসুবিধাগুলি সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠী সমভাবে

ভোগ করতে পারে না। উঁচু জাতিগোষ্ঠীগুলির ভাষা, পোষাক বা ব্যবহারপ্রণালী নীচু জাতি-গোষ্ঠীগুলি ব্যবহার করতে পারত না।

v) **পেশাগ্রহণের ব্যাপারে বেছে নেবার অধিকার-এর অভাব** (Lock of Choice of occupation)

প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠী বংশানুক্রমিক ভাবে একটি পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। পবিত্রতা-অপবিত্রতার নিয়ম থাকার ফলে কোনও একটি জাতির বংশানুক্রমিক পেশার দ্বারা সেই জাতির সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হয়। যেমন ব্রাহ্মণদের জাতিগত পেশা ছিল অধ্যয়ন ও পূজার্চনা অন্যদিকে নীচু জাতিরা চুল কাটা, কাপড় কাটা বা চামড়ার কাজ করত। অস্পৃশ্যরা সবচেয়ে অপরিষ্কার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অবশ্য হিন্দু সমাজে পেশা পরিবর্তনের উদহারণও পাওয়া যায়। আর তাছাড়া কখনও কখনও নতুন পেশা উদ্ভবের মাধ্যমে নতুন জাতিগোষ্ঠী তৈরী হত। তবে কোনও অবস্থাতেই শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পূজার কাজ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ করতে পারত না।

vi) **বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা (Restrictions on Marriage)**

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সেই কারণে ব্যক্তিকে তার নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করতে হত, অর্থাৎ তারা অন্তর্বিবাহ (endogamy) মেনে চলত। ঘুরিয়ের মতে অন্তর্বিবাহ-ই জাতিভেদ প্রথার মূল বৈশিষ্ট্য।

জাতিগোষ্ঠীর যে কোনও অংশ এই অন্তর্বিবাহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

জাতি, গোত্র এবং আত্মীয়তা বন্ধনের পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship among caste, subcaste and kinship)

ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে জাতি-ভিত্তিক অন্তর্বিবাহ (endogamy) ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জাতিব্যবস্থা হিন্দু সমাজে জ্ঞাতি-কুটুম্ব সম্পর্ককে পরিচালিত করেছে।

তিনি দেখিয়েছেন যে একেকটি জাতি কালক্রমে অনুজাতি (subcaste)-তে বিভক্ত হয়েছে এবং একেকটি অনুজাতি আবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের অনুজাতিতে বিভক্ত হয়ে গেছে নানা স্থানিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণের জন্য। প্রথমতঃ একটি জাতির লোকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে বিয়ে করবে, অন্য জাতের লোকেদের সাথে বিয়ে করবে না। এর দ্বারা জাতিব্যবস্থার মধ্য উচ্চাবচ ক্রমাধিকারের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একটি জাতি যখন দুটি অনুজাতিতে বিভক্ত হয় তখন আবার প্রত্যেকটি অনুজাতি তার নিজের মধ্যেই তার সদস্যদের বৈবাহিক সম্পর্ক সীমিত করে রাখে। আবার প্রথম স্তরের একটি অনুজাতি দ্বিতীয় স্তরের দুটি অনুজাতিতে বিভক্ত হয় তখনও এই অন্তর্বিবাহ নীতি অনুসৃত হয়। এইভাবে প্রতিটি অনুজাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য জাতিব্যবস্থার ঐক্যভিত্তিক বাতাবরণে সুনিশ্চিত হয়।

অন্তর্বিবাহ-এর পাশাপাশি গোত্রভিত্তিক বহির্বিবাহের নীতিও হিন্দু সমাজে প্রচলিত। ঘুরিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন এই নীতিটির কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই কেননা একই গোত্রের লোকেদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক কোনো ভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

জাতি এবং রাজনীতি (Caste and politics)

জাতি, গোত্র এবং আত্মীয়তার মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে যে ঐক্য স্থাপিত হয় ঘুরিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে সেই ঐক্য নানাভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতিতে জাতি আনুগত্য এই বিচ্ছিন্নতার একটি

অন্যতম কারণ বলে ঘুরিয়ে মনে করেছিলেন। এই ঐক্য নষ্ট করার পিছনে ব্রিটিশ নীতিও কাজ করেছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন এবং তার সমালোচনাও করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তিন ধরনের পরিবর্ত্তন এনেছিলেন ১) তারা এমন কতকগুলি আইন সংক্রান্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্ত্তন এনেছিলেন যার ফলে আইনের কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ; ২) কারিগরী ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন এবং তার ফলে ৩) পেশার পরিবর্ত্তন। এর ফলে জাতির চিরাচরিত ভিত্তিতে পরিবর্ত্তন আসে কিন্তু প্রথাটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকে কোনও পরিবর্ত্তন আসেনি। ঘুরিয়ের মতে ইংরেজ সরকার জাতি প্রথার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তনে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। উপরন্তু তারা চেয়েছিলেন যাতে এই পরিবর্ত্তন না আসে। অর্থাৎ পরিবর্ত্তনটা উপরে উপরে ছিল এবং এর ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একধরণের অবিশ্বাস ও সন্দেহ তৈরী হয় জাতিপ্রথার ঐক্যতে ফাটল ধরাতে শুরু করে। এই সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিজের নিজের জাতির আনুগত্য দেখিয়ে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন যা এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিচায়ক। তাছাড়া ইংরেজ সরকার অস্পৃশ্যতার মত একটি বিশ্রী প্রথা বন্ধ করতেও কোনও রকম প্রয়াস নেননি বলে ঘুরিয়ে অভিযোগ করেছেন।

ব্রিটিশ সরকার অনুন্নত সম্প্রদায় ও উপজাতিদের জন্য উন্নত সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে নথিভুক্ত করে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নেন। ঘুরিয়ে কিন্তু এই পৃথিকীকরণের এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে চিরকালের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বহাল রাখলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রকৃত উন্নয়ণের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না উপরন্তু অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিজেদের কায়েমী স্বার্থ তৈরী করে নিতে পারে। ঘুরিয়ের এই আশঙ্কা পুরোপুরি অমূলক বলে প্রমাণিত হয়নি। দেখা গিয়েছে যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সদস্যরা সকলে সমানভাবে সুযোগসুবিধার সুযোগ নিতে পারেনি বলে তাদের মধ্যে ও নানা ধরণের বৈষম্যমূলক গোষ্ঠী তৈরী হয়ে গেছে।

৪.৪ উপজাতিদের (Tribes) সম্বন্ধে আলোচনা

ঘুরিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ্য করেন যে কিছু সামাজিক নৃবিজ্ঞানী (social authropologist) এবং বৃটিশ প্রশাসক (Brititsh Administrators) ভারতবর্ষের উপজাতিদের সাধারণ ভারতীয় মূলস্রোত (mainstream of Indian tradition) থেকে আলাদা একটি গোষ্ঠী হিসাবে মনে করতে শুরু করেছেন। উপজাতিরা লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ে বা বনে জঙ্গলে বাস করত বলে এই নৃবিজ্ঞানী বা প্রশাসকেরা উপজাতিদের ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে পৃথক করে দেখছিলেন। ঘুরিয়ে কিন্তু উপজাতিদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন উপজাতিরা এমন একটি গোষ্ঠী যারা কিছু সময়ের জন্য সাধারণ ভারতীয় জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে (tribes have temporarily lost their contact with the rest of the Indian society-they are the aborigines so-called)। উপজাতিরা ভারতবর্ষের 'তথা-কথিত আদিবাসী'।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘুরিয়ের সঙ্গে বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ভেরিয়ার এলউইন-এর (Verrier Elwin) মতপার্থক্য উল্লেখযোগ্য। ভেরিয়ার এলউইন মনে করতেন উপজাতিরা সর্ব্ব প্রাণীবাদী (animists)। তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, ভাষা সবকিছুই হিন্দুদের থেকে আলাদা। তাছাড়া বহু উপজাতি গোষ্ঠীর জমি হিন্দু বা অন্যান্য সম্প্রদায়রা নানাভাবে কেড়ে নেয়। সেই কারণে এলউইন উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা তৈরী করার কথা বলেন।

ঘুরিয়ে এলউইন-এর এই মতের সঙ্গে একেবারেই একমত ছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন যে উপজাতিদের এইভাবে আলাদা করে দেখা ভারতবর্ষের ঐক্যস্থাপনের পথে পরিপন্থী। তিনি প্রচুর সংখ্যক

ঐতিহাসিক তথ্য এবং সাম্প্রতিক ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে বহুদিন থেকেই উপজাতিরা অন্যান্য সম্প্রদায়ে বিশেষ করে হিন্দুদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। উপজাদিতের মধ্যে জাতিভিত্তিক গোষ্ঠী নেই বলে তাদের মধ্যে পেশাগত কোনও বিভাজন নেই। ফলে উপজাতি সমাজে অর্থনৈতিক সুরক্ষার একান্ত অভাব। উল্টোদিকে হিন্দুদের মধ্যে পেশাগত বিভাজন থাকার ফলে প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দিকটি সুরক্ষিত থাকে। এই অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য উপজাতিরা বিভিন্ন সময়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। পরবর্ত্তীকালে নির্মল কুমার বসু তাঁর হিন্দু ধর্মের মধ্যে উপজাতিদের আনয়নের পদ্ধতি-তে (Hindu Method of Tribal Absorption) এই ব্যাপারটি দেখান। সাধারণতঃ উপজাতিরা হিন্দু সম্প্রদায়ের নীচের দিকে স্তরভুক্ত হয় এবং এইভাবে গৃহীত হবার ফলে তারা কোনও একটি পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। এবং পুরো ব্যাপারটির মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সুরক্ষা থাকে। ঘুরিয়ে এই ব্যাপারটির মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সমাজের ঐক্য সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করেছেন। ঘুরিয়ে এখানে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সচলতা, সক্রিয় গতিশীলতা (dynamism) এবং উদার সর্ব্বজনীনতার (Catholicity) দিকগুলিকে বোঝাতে চেয়েছেন।

ঘুরিয়ে অবশ্য স্বীকার করেছেন যে উপজাতিরা অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়েছে ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায় বা হিন্দু মহাজনদের দ্বারা। এইসব গোষ্ঠী অনেক সময় উপজাতিদের ঠকিয়ে তাদের জমিও কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু ঘুরিয়ে এখানেও দেখিয়েছেন যে এই ধরণের প্রতারণা বা ঠকানো শুধুমাত্র যে উপজাতিদের সঙ্গে হয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য গোষ্ঠী এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সঙ্গেও হয়েছে যারা নানাবিধ সমস্যার কারণে সামাজিকভাবে দুর্বল। ঘুরিয়ে মনে করতেন এই প্রতারণার মূল প্রোথিত হয়ে আছে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত আইন ব্যবস্থা ও করব্যবস্থার উপর। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের নীতি অনুযায়ী বনাঞ্চল ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পত্তি ঘোষিত হবার ফলে বনে প্রবেশ করতে গেলেও সরকারের অনুমতি এবং সরকারের কাছে কর প্রদান করা বাধ্যতামমূলক হয়ে দাঁড়ায়। ঘুরিয়ে বলেন যে এর ফলে শুধু উপজাতি কেন অন্যান্য গোষ্ঠীর পক্ষেও বনাঞ্চল ব্যবহার করা অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রসাকেরা এবং নৃবিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র উপজাতিদের আলাদাভাবে অসুবিধা-আক্রান্ত গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করে এবং আলাদাভাবে তাঁদের উন্নয়নের কথা ভেবে সাধারণ ভারতীয় সামাজিক ধারাকে খণ্ডিত করার চেষ্টা করেছেন যা কিনা অবশেষে ভারতীয় সামাজিক সংহতিকেই ব্যাহত করবে বলে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন।

৪.৫ ভারতীয় ধর্মের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

ঘুরিয়ে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ বিষয়ে কতকগুলি নতুন দিক উন্মোচন করেছিলেন। তিনি ধর্মের বিষয়ে মোট ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেন i) indian Sadhus (1953), ii) Gods and Men (1962), iii) Religious Consciousness (1965), iv) Indian Acculturation (1977), v) Videc Indian (1979), vi) The Legacy of Ramayana (1979) প্রত্যেকটি বইতেই ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন ধর্মের সামাজিক ভূমিকা কী ? ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন, যে কোন সংস্কৃতি পাঁচটি মূল বিষয়ের উপর গ্রথিত ১) ধর্মীয় সচেতনতা (religious Consciousness), ২) নীতিচেতনা (Conscience), ৩) ন্যায়-পরায়ণতা ও যথাযথ আচরণ (justics), ৪) বাধাহীনভাবে বিদ্যাচর্চা (free pursuit of knowledge) এবং সহ্যশীলতা (tolerance)। তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় সমাজের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ধর্ম ভারতীয় সমাজের একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। ঘুরিয়ে-র ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা প্রাচ্যবাদী (Orientalist) এমন কী প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মাক্স হেবারের ধর্ম বিষয়ের আলোচনা থেকেও আলাদা।

ঘুরিয়ে প্রথমেই বলেছেন যে ব্যক্তি ও সমাজ দেব-দেবী সৃষ্টি করেছে (men and society are the creators of gods and goddesses)। তিনি দেখিয়েছেন যে ধর্মীয় ধারণাগুলি কখনই এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনা। তারা সমাজজীবনের চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্ট হয় এবং পরিবর্ত্তিত ও হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে হিন্দু ধর্মে প্রধানতঃ পাঁচজন মুখ্য দেবতার উল্লেখ্য পাওয়া যায়। সূর্য, শিব, বিষ্ণু, গণেশ এবং দেবী। এই মূল পাঁচজন দেব-দেবীর থেকেই ভারতবর্ষে অসংখ্য দেব-দেবীর সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অসংখ্য দেবদেবীর উপস্থিতি ভারতীয় বৈচিত্র্য যেমন এনেছে, সেই বৈচিত্র্য কিন্তু বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করে ঐক্যস্থাপনেই সহায়তা করেছে কারণ এই অসংখ্য দেব-দেবীর উৎসস্থল ওই মূল পাঁচ দেব-দেবী। এবং উৎস থেকে এই বৈচিত্র্য ঘটেছে কারণ এ দেব-দেবীদের ধারণা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লৌকিক ধারণা, এমনকি অন্যান্য গোষ্ঠীর ধারণার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন কখনও নতুন নতুন ধারণা নিজেদের ধারণার মধ্যে গ্রহণ করে আবার কখনও নতুন ধারণার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য (Accommodation) নিজেদের পরিবর্ত্তন করে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় দেব-দেবীরা অনেক সময় পশু-পাখির আকৃতি নিয়েও পূজিত হয়ে থাকেন যেমন নৃসিংহ বা হনুমান। এর ফলে হিন্দুধর্মে বর্ণিত ঐক্য সামাজিক, নৈসর্গিক এবং পশুপাখির জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃতও বটে।

ঘুরিয়ে-র ধর্ম বিষয়ে আলোচনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তাঁর সাধুদের সামাজিক ভূমিকার বিশ্লেষণ। ঘুরিয়ে তাঁর Indians Sadhus গ্রন্থে দেখিয়েছেন ভারতীয় সাধুরা সমাজের নিয়মকানুনের থেকে বাইরে থেকেও সমাজ থেকে কিন্তু বিচ্ছিন্ন নন।

ঘুরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের **আনন্দমঠ** কে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিয়ে দেখিয়েছেন যে সন্ন্যাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কিভাবে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। এখানেও ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন যে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধু সন্ন্যাসীরাও তাঁদের কাজের লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করেছেন। সাধুরা সংসারের মধ্যে না থেকেও সমাজের মঙ্গলার্থে নানাধরণের সেবামূলক কাজকর্ম করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উল্লেখ করেছেন যারা সবসময়ই সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছেন। তাছাড়া তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এই প্রাতিষ্ঠানিক সাধু-সন্ন্যাসীরাই সবচেয়ে আগে আর্ত্তদের সেবার কাজে এগিয়ে যান।

ঘুরিয়ে ভারতীয় ধর্ম ও ভারতীয় সাধুর আলোচনা— বিষয়গুলিকে একটি নতুন আঙ্গিকে হাজির করেছেন যা প্রাচ্যবাদীদের (orientalists) ধরণা এমনকি বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী মাক্স হেবারর-এর আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে মনে রাখতে হবে যে এখানেও ঘুরেয়ের মূল তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ছিল কিভাবে ভারতীয় ধর্ম ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন করেছে।

৪.৬ গ্রামীণ এবং নগর সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা

ঘুরিয়ে সবসময় নগরায়নকে স্বাগত জানিয়েছেন। বস্তুতঃ ঘুরিয়ে-র নগরায়নের ধারণা থেকে এটা পরিষ্কার যে তিনি আধুনিকতা (modernity) এবং আধুনিকীকরণের (modernisation) বিপক্ষে তো ছিলেনই না বরং তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন কিভাবে নগরায়ন এবং আধুনিকতার গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী (traditional rural) ব্যবস্থার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ''rurfanization'' বা গ্রামভিত্তিক নগরায়নের কথা

বলেছেন। তিনি মনে করতেন যে নগর-সমাজে গ্রাম-সমাজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ নগর তার উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান, গবেষণার, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা ও বিভিন্ন বিনোদন প্রকরণের মাধ্যমে যেমন একটি উন্নততর সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো তৈরী করে, নগরকে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেখানে পানীয় জল, মুক্ত বিশুদ্ধ হাওয়া এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ গাছপালা থাকে। সেই কারণেই ঘুরিয়ে মনে করতেন যে একজন নগর রূপকারের (urban planner) নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির প্রতি সবসময় খেয়াল রাখা উচিত এবং যাতে সমস্যাগুলি না হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

১) পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা।

২) অহেতুক মানুষের ভিড়ের সমস্যা (problem of human congestion).

৩) যান চলাচলে বিঘ্ন এবং যানজট সমস্যা (traffic congestion)

৪) সাধারণ যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ (regulation of public velicles)

৫) বম্বের মত শহরাঞ্চলগুলির রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা (insufficiency of railway transport)

৬) গাছ নষ্ট করা এবং কেটে ফেলা,

৭) শব্দ দূষণ এবং

৮) পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটা।

ঘুরিয়ে মনে করতেন যথাযথ পরিকল্পনা মাধ্যমে নগরের এই সমস্যাগুলি দূর করে নগর ও গ্রামে মধ্যে সুষ্ঠ ঐক্য সাধন করা যায় (organic unity)। ব্রিটিশ সরকার ঐক্য বিঘ্নিত করেছিল বলে মনে করতেন ঘুরিয়ে। এবং তাঁর মতে নগরায়ন শিল্পায়নের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ব্রিটিশ সরকার নগরায়নকে বা নগর সমাজকে দেখাতে শুরু করেছিলেন। ঘুরিয়ে মনে করতেন নগরকে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের একটি কেন্দ্র (towns are centres of cultural excellance) হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

উপসংহারে বলা যায়, আলাদা বিষয় হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের পঠন পাঠন শুরু হবার পর ঘুরিয়ে দেখালেন যে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ভারতীয় সমাজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বিশেষ সহায়তা করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঘুরিয়ে, জি এস **Caste & Race in India.**

২। প্রামানিক, এস কে. **Sociology of G.S Ghurye Rawat Publications, Jaipur 1994.**

১৫.২ বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯)

প্রস্তাবনা :

১৯১৭ সাল বোম্বাই (মুম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের পঠন পাঠন আলাদাভাবে শুরু হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৭ সাল থেকেই রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy)র একটি অংশ হিসাবে সমাজবিজ্ঞান পড়ানো শুরু হয়। এই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে পরবর্তী সময়ে বিনয় কুমার সরকার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বিনয় কুমার সরকার সংস্কৃতি ইংরাজী ও বাংলাভাষা ছাড়া নানা বিদেশী ভাষা অত্যন্ত ভালভাবে জানতেন। তাছাড়া তাঁর নানা বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল ভারতীয়দের যথা হিন্দুদের প্রত্যক্ষবাদ বা ইহজাগতিক বিষয় সংক্রান্ত ধারণাকে তুলে ধরা।

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানতে পারবেন

১) বিনয় কুমার সরকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

২) ভারতীয় সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজের তুলনামূলক আলোচনার ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের তরফে দুক্ষেত্রে দুইরকম মানদণ্ডের ব্যবহার এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভুল ধারণা উপস্থাপন।

৩) প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) সম্বন্ধে তাঁর ধারণা

৪) সমাজের আলোচনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

৫) বিনয় কুমার সরকারের প্রগতি (progress) সম্বন্ধে ধারণা।

৪.২.১ বিনয় কুমার সরকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৮৭ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলার মালদহ জেলায় বিনয় কুমার সরকারের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল সুধন্য কুমার সরকার। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিনয় কুমার এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডেয়েট পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করে সম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০৫ সালে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৫ সাল বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং বিনয়কুমার সরকারের শিক্ষাজীবনেরও একটি উল্লেখযোগ্য সময়। লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালে অবিভক্ত বাংলা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং এই বিভাজন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। সমস্ত বাংলা এই সময় এক স্বদেশী আন্দোলনে মেতে ওঠে যার উদ্দেশ্য ছিল ১) দুই বাংলাকে এক করা এবং ২) ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ শাসকদের দেশ থেকে হটানো। বিনয় সরকার এই আন্দোলনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। ফলতঃ আমরা দেখি তিনি স্টেট্স্ স্কলারশিপ (States Sclolarship) গ্রহণ করলেন না এবং ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরীও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই আন্দোলনের অন্যতম দিক হল বিদেশী সামগ্রী বর্জন করা ও স্বদেশী ধ্যান ধারণার ওপর গুরুত্ব প্রদান।

বিনয় সরকার ডন (Dawn) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র ছিলেন একজন স্বদেশী শিক্ষাবিদ্। তিনি ইংরেজ প্রণীত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন এবং মনে করতেন যে এই বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় ধ্যানধারণার কোনও যোগ নেই।

বিনয় সরকার সতীশচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে দেশের যুবাসম্প্রদায়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করার আহ্বান জানান এবং নিজেও এই শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করেন। অবশ্য পরে কিছু শুভানুধ্যায়ীর উপদেশে তিনি কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয় থেকে ১৯০৭ সালে ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষা দেন এবং পঞ্চম স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এম. এ. পাশ করার পর তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এই স্বদেশী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের জন্য কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার উপর গুরুত্ব এবং ২) সাথে সাথে ভারতীয় ভাবধারার উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। বিনয় সরকার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরণের স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন।

বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় সরকার কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন The Science of History and Hope of Mankind (1912) এবং Introduction of Science of Education (1913)। এছাড়াও তিনি বাংলাতে বহু পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেন যার মাধ্যমে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সুবিধা ঘটে। ১৯১৪ সালে তাঁর "শুক্রনীতি"-র ইংরাজী অনুবাদ এবং The Positive Background of Hindu Sociology-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত বিনয় সরকার প্রত্যেকটি গ্রন্থের একটি বিষয়ের উপর জোর দেন তা হল **ভারতীয়দের ইহজাগতিক ব্যাপারে আগ্রহ** এবং **ভারতীয় গুণগান বা প্রশংসা যা ভারতীয়দের তাদের নিজের সম্বন্ধে শুধু সচেতনই করবেনা, একই সঙ্গে তাদের ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে গর্বিত করে তুলবে।**

১৯১৪ সালে বিনয় সরকার বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় যান। এই সফরকালে তিনি চীন এবং আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে দেশে ফিরে আসার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা করতে করতে তিনি বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত **Creative India** এবং **Positive Background of Hindu Sociology**র পরিবর্ধিত সংস্করণ।

১৯৪৯ সালের ২৪ শে নভেম্বর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মাত্র দুই বৎসর পরে আমেরিকার ওয়াশিংটন ডি.সি.তে শিক্ষামূলক ভাষণ সংক্রান্ত সফলকালে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

৪.২.২. ভারতীয় সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজের তুলনামূলক আলোচনায় ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্ত মানদণ্ডের পার্থক্য ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভুল ধারণা উপস্থাপন

বিনয় সরকার ভারতবর্ষকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করবার জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গী (Perspective) গড়ে তোলার চেষ্টা করে গেছেন। ভারতবর্ষকে সেই সময় পর্যন্ত প্রাচ্যবাদীরা (orientalists), খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা (evangelists) এবং ব্রিটিশ প্রশাসকেরা উপস্থাপন করছিলেন। প্রাচ্যবাদীরা ভারতীয়দের আধ্যাত্মিকতা পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ই শুধু দেখলেন। অন্যদিকে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা ভারতীয়দের সব বিষয়কেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলেন, কারণ তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্মের গুণগান গাওয়া ও তার প্রসার ঘটানো। এবং তা সম্ভব শুধুমাত্র খ্রীষ্টধর্মের থেকে অন্য ধর্মকে খাটো করে দেখানোর মধ্য দিয়ে। প্রশাসনের চাহিদা মেটানোর জন্য তৈরী ব্যাখ্যাগুলিতে বেশীরভাগ সময়েই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল না। এর উপরে ছিল বুগ্‌ল্, সেনার্টি, মাক্স মুয়েলার বা মাক্স হ্বোবারের মত ব্যক্তিদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা। তাঁরা বলেছেন যে ভারতীয়রা ইহজাগতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, তারা সবসময়ই আধ্যাত্মিকতা, নির্বাণ ইত্যাদি পরাজাগতিক ব্যাপারে বেশী

আগ্রহী। সেই কারণে ভারতীয়রা অনগ্রসর এবং তারা ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে।

বিনয় কুমার সরকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নেতিবাচক ধারণাগুলির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি দেখালেন যে ইউরোপ এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা পাশ্চাত্য দর্শন আলোচনা করার সময় পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা আইন বিষয়ে ধারণাগুলির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের ধর্ম, বিশ্বাস, দেব-দেবীর ধারণাও আলোচনা করেন। কিন্তু সেই একই বৈজ্ঞানিকেরা যখন ভারতবর্ষকে আলোচনা করতে বসেন তখন তাঁরা ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের মানব মন (mind), আত্মা (Soul), বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (universl) অন্তর্জ্ঞান (initution), ধ্যান (meditation) প্রভৃতি বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করেন ; ভারতীয়দের বিষয় সম্পত্তি (property), রাষ্ট্র (state), সমাজ (society), আইন (law), বার্ত্তাশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র এগুলির কোনওটিকেই বিশ্লেষণ করেন না। হিন্দু দর্শনের আধুনিক আলোচনাতেও এই ধরনের ত্রুটি দেখা যায় যখন শুধুমাত্র 'মোক্ষ'-র উপরে আলোচনা হয় ও চতুবর্গের অন্য তিনটি বর্গ যথা ধর্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে কোনও আলোচনাই হয় না। সুতরাং বিনয় সরকার দেখালেন যে এ সমস্ত আলোচনাগুলিই একপেশে (Partial), অন্যায্য (unjust) এবং ভ্রান্তিমূলক (errorneous)।

বিনয় কুমার সরকার তাঁর বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করলেন যে ভারতীয়রা শুধুমাত্র পরজাগতিক (otherworldly) ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, তারা ইহজাগতিক (material) বিষয়েও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তাছাড়া ইউরো-আমেরিকান পণ্ডিতেরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনা কালে তুলনার মানদন্ডের নির্ধারন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যৈ বৈষম্য করে থাকেন তারও তীব্র নিন্দা করে বিনয় সরকার কিভাবে তুলনামূলক আলোচনা করা উচিত সেই পদ্ধতি নির্ধারণ করারও চেষ্টা করেন।

৪.২.৩ প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) সম্বন্ধে বিনয় সরকারের ধারণা

সমাজবিজ্ঞান বা যে কোনও সমাজ শাস্ত্রে বিনয় কুমার সরকারের প্রথম পরিচয় প্রত্যক্ষবাদের প্রবক্তা হিসাবে এখানে মনে রাখার দরকার যে বিনয় কুমার সরকারের প্রত্যক্ষবাদের ধারণা কোতের প্রত্যক্ষবাদ বা (Positivism) এর ধারণার থেকে আলাদা যদিও সরকার স্বীকার করেছেন যে প্রত্যক্ষবাদের ধারণাটি তিনি কোঁতের (Posittism) থেকে নিয়েছেন আর এই প্রত্যক্ষবাদের ধারণা সরকারের The Positive Background of Hindu Sociology নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। যদিও বিনয় সরকারের অন্যান্য গ্রন্থে বিশেষতঃ Chinese Religion through Hindu Eyes (1916) এবং The Science of History the Hope of Mankind (১৯২২) গ্রন্থ দুটিতেও এই প্রত্যক্ষবাদের সম্বন্ধে প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক ধারণা কিছু দেখা যায়। প্রথম গ্রন্থটিতে তিনি দেখাচ্ছেন যে 'নির্বাণ' শুধুমাত্র এই শব্দটি দিয়ে তিন হাজার বছর ধরে বহমান কোনও সভ্যতাকে ধরা, বোঝা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মানুষের মত এশিয়া তথা ভারতবর্ষের মানুষও শুধুমাত্র পরাজাগতিক বিষয় (otherworldliness) নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন নি, তাঁরা ইউরো-আমেরিকার অধিবাসীদের মত একই সঙ্গে ইহজাগতিক ব্যাপারেও সমান আগ্রহী ছিলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে আমরা দেখি যে বিনয় সরকার বিভিন্ন সভ্যতা তুলনার মানদণ্ডকে কোনও একমাত্রিক বা একরৈখিক (unilinear) পদ্ধতিতে না দেখিয়ে বহুরৈখিক (multilinear) পদ্ধতিতে দেখাবার কথা বলছেন। The Positive Background of Hindu Sociology (১৯২১) গ্রন্থে তিনি দেখান যে ভারতীয়রা তথা হিন্দুরা ইহজাগতিক ব্যাপারে সবসময়েই আগ্রহী ছিলেন। বহু উদাহরণ দিয়ে তিনি ভারতীয়দের ইহজাগতিক ব্যাপার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক (spiritual) কাজকর্মের মধ্যে বহু জাগতিক (mendane) সমস্যার সমাধান সূত্র রয়েছে।

৪.২.৪ সমাজের আলোচনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ

আগের বিভাগে আমরা দেখেছি যে বিনয় কুমার সরকার সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় বহুরেখ বিশিষ্ট (multilinear) পদ্ধতির প্রয়োগের কথা বলেছেন। তাঁর Positive Background of Hindu Sociology প্রকাশিত হবার পর থেকেই অর্থাৎ ১৯২১ সাল বা তারও আগে ১৯১৬ সাল থেকে শ্রীসরকার দেখালেন যে ইতিহাসের দীর্ঘকালব্যাপী ভারতবর্ষ ও ইউরোপে উন্নয়ন প্রায় সমানতালেই চলছিল। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ভারত এবং ইউরোপ সমান জায়গাতেই ছিল। কিন্তু একমাত্র শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই ভারতবর্ষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইউরোপ তথা সারা পশ্চিমী দুনিয়া থেকে পিছিয়ে পড়তে লাগল। তিনি নিম্নলিখিত সমীকরণ বা equation গুলির মাধ্যমে দেখালেন যে শিল্পবিপ্লবের পরে ইউরোপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে ভারতবর্ষ **জাগতিক** বা বস্তুগত সভ্যতার তথা material civilization এর ক্ষেত্রে ইউরোপ থেকে মোটামুটিভাবে ১০০ বছর পিছিয়ে রইল।

১) নতুন এশিয়া (১৮৮০-১৮৯০)-আধুনিক ইউরো-আমেরিকা (১৭৭৬-১৮৩২)

২) তরুণ ভারত বা Young India (১৯৩০-৩৫)-ইউরো-আমেরিকা (১৮৪৮-১৮৭০)।

এই সঙ্গে তিনি ভারতীয়দের ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শেখার উপর গুরুত্ব দেন এবং বলেন যে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে ভারত ইউরোপের সঙ্গে আবার সমান তালে চলতে পারবে।

এই সমীকরণগুলি বিনয় সরকারের সমাজ বিশ্লেষণের পদ্ধতি-র দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিনয় সরকার তুলনামূলক আলোচনায় বৈষম্যমূলক মানদণ্ডের ব্যবহারের বিরোধিতা করেছিলেন। এবারে তিনি দেখালেন যে সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় কতকগুলি জিনিস মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ সভ্যতা কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনা, তা সমসময়ই গতিময় এবং পরিবর্ত্তনশীল। সময় (time) এবং ব্যক্তিমানুষ (People) এর প্রেক্ষিতে তা সমসময়ই পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্ত্তনগুলি ধাপে ধাপে বা stage-by stage ঘটে থাকে এবং তৃতীয়তঃ প্রত্যেকটি ধাপ বা stage-এর চালিকাশক্তি বা চৈতন্য ও সময়ের প্রভাব (spirit) একটি অপরটির থেকে পৃথক। সমাজবিজ্ঞানীকে পরিবর্ত্তনের এ ধাপগুলির চালিকাশক্তি বা spirit বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলেই তা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ হয় ; অন্যথায় তা কল্পনাভিত্তিক একপেশে আলোচনায় (Onesided imaginary discussion) পর্যবসিত হয়।

পশ্চিমী সমাজ বিজ্ঞানীরা ভারতের ধর্ম্মোন্মাদনা বা আধ্যাত্মিকতার সাথে পশ্চিমী সমাজের আধ্যাত্মিকতার তুলনা না করে পশ্চিমী সমাজের ইহজগত নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় সমাজের পরলোক সম্বন্ধে চিন্তার তুলনা করেন। দ্বিতীয়তঃ শিল্পবিপ্লবের আগে ভারতীয় সমাজের অবস্থার সঙ্গে সমসাময়িক পশ্চিমী সমাজের তুলনা না করে শিল্পবিপ্লবোত্তর পশ্চিমী সমাজের সঙ্গে শিল্পবিপ্লবের সুফল বঞ্চিত ভারতীয় সমাজের তুলনা করেন বা ভারতীয়দের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ভ্রান্তির কবলে পড়ে যান।

৪.২.৫ বিনয় কুমার সরকারের 'প্রগতি' বা Progress সম্বন্ধে ধারণা

সমাজবিজ্ঞানে বিনয় কুমার সরকারের অবদান আর একটি জায়গায় খুব গুরুত্বপূর্ণ যেখানে বিনয় সরকার প্রগতি বা অগ্রগতি-র ধারণা উপস্থাপন করলেন। এই ধারণাটির মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানী এবং সমাজিক বিজ্ঞানীদের প্রগতি সম্বন্ধে চিন্তাধারাকে সমালোচনা করলেন আর এক দিকে তিনি বললেন যে

ভারসাম্যহীনতা বা সামাজিক মানসিক অস্থিরতা (disequilibrium) সৃজনশীলতার দিকে ব্যক্তিমানুষ, গোষ্ঠী বা সমাজকে ঠেলে দেয়।

বিনয় সরকার দেখালেন যে পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানী বা সামাজিকবিজ্ঞানীরা (যেমন হেগেল, মার্ক্স এবং অন্যান্যরা) প্রগতির যে তত্ত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে এক চূড়ান্ত অবস্থার ধারণা (finality) দেখা যায় যেন তারপরে আর কিছুই থাকে না। হেগেল ও মার্ক্স বর্ণিত তত্ত্ব-বৈপরীত্য-সংশ্লেষ-এর নৈরন্তর্যে হেগেল-এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং মার্ক্স এর ক্ষেত্রে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার শ্রেণী দ্বন্দ্বের অবসানে চূড়ান্ত পর্যায়-এর ইঙ্গিত দেয়। বিনয় কুমার সরকারের কাছে এই চূড়ান্ত পর্যায়ের ধারণা গ্রহণীয় নয়। যেমন মার্ক্স যুক্তির দ্বারা সমর্থিত তত্ত্ব (thesis) এবং তার বৈপরীত্য (antithesis) এর সংঘাতে সংশ্লেষ (synthesis) পর্যায়-এ উন্নীত হবার কথা বললেন। বিনয় সরকারের প্রশ্ন হল দু'টি ১) এই সংশ্লেষ-এর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার মধ্যে কি এক চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে না? ২) এই সংশ্লেষ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর ব্যক্তিমানুষ কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে? বা এই সংশ্লেষ পর্যায়ে কি সবসময় সুব্যবস্থা বিরাজ করবে?

বিনয় সরকার বললেন, ব্যক্তিমানুষ-এর বা গোষ্ঠী বা সমাজ এর কাছে কোনও অবস্থাই চূড়ান্ত অবস্থা নয়। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ কখনই একজায়গায় স্থির বা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে না। তাছাড়া সংশ্লেষ পর্যায়েও কিন্তু সবসময় সুব্যবস্থা থাকে না। তিনি আবার কতকগুলি সমীকরণের সাহায্যে এই অগ্রগতির ধারণাকে বোঝালেন। তিনি দেখালেন ১) a-not-a $\rightarrow$ b ২) b-not-b $\rightarrow$ c ৩) c-not-c $\rightarrow$ d.....n(infinity) অর্থাৎ প্রগতি বা অগ্রগতি ধাপে ধাপে এগিয়ে অন্তহীন ভাবে চলে। প্রত্যেকটি ধাপে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি থাকে, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় এবং ব্যক্তিমানুষের শুভবুদ্ধি প্রসূত প্রচেষ্টায় এই দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে পরের ধাপে গোষ্ঠী বা সমাজ এগিয়ে যায়। এই নতুন ধাপটি আগের ধাপ বা পর্যায় থেকে গুণগত এবং মানগত দিক দিয়ে আলাদা। কিন্তু এই ধাপে আবার নানা ধরণের অসুবিধা দেখা দেয় এবং পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আবার ব্যক্তিমানুষের শুভপ্রচেষ্টায় তার অবসান ঘটে ও সমাজ বা গোষ্ঠী এগিয়ে চলে। এইভাবে প্রগতি বা অগ্রগতি অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে যায়। বিনয় সরকার প্রগতি-র এই ধারণাকে বলেছেন সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা প্রসূত প্রগতি (Progress as Creative disequilibrium)। অর্থাৎ ভারসাম্যজনিত স্থিতাবস্থা কোনও সমাজে কখনও থাকে না। এবং ভারসাম্যহীনতা, বিনয় সরকারের মতে, সৃজনশীল হয়ে ওঠে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিমানুষের প্রচেষ্টায়। সমাজ বা গোষ্ঠী সবসময় এগিয়ে চলে প্রথমে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার দিকে। কিন্তু ভারসাম্য কখনও চিরস্থায়ী নয় বলে তা সবসময়ই বিঘ্নিত হয় নতুন সমস্যার দ্বারা। ব্যক্তিমানুষের প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান হয়, সমাজে আবার ভারসাম্য ফিরে আসে; কিন্তু এই ভারসাম্য আগের পর্যায়ের ভারসাম্যের থেকে আলাদা। বিনয় সরকার দেখিয়েছেন ছান্দোগ্য উপনিষদের 'চরৈবেতি' বা উপনিষদের "অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোর্দিগময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়"-র মধ্যে এই এগিয়ে চলার সুর চিরন্তন। আর এই থেকেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী কখনই প্রগতি বিমুখ নয়।

পরবর্ত্তী কালে বিনয় সরকার কিন্তু প্রগতির এই ধারণা থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেলেন। বিনয় সরকার সবসময়ই পশ্চিমের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি-কে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এবং তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষকে পশ্চিমের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিখতে হবে। আর পশ্চিমের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিখলেই ভারত পশ্চিমের সঙ্গে একতালে প্রগতি বা অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। অর্থাৎ যে বিনয় সরকার এতদিন পর্যন্ত বহুরেখ বিশিষ্ট প্রগতি এবং পদ্ধতির কথা বললেন সেই বিনয় সরকারই শেষে গিয়ে

প্রগতির এক ঋজুরেখ (rectilinear) বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দিলেন যেখানে প্রগতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ও প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Bhattacharya, S. K. Indian Sociology. The Role of Benoy Kumar Sarkar. University of Burdwan 1990

২। মুখোপাধ্যায় হরিদাস (সং) **বিনয় সরকারের বৈঠকে** ১ম খণ্ড (কলিকাতা, দেজ পাব্লিশিং হাউস ২০০২)

৩। Sarkar, B.K. **The Positive Bacground of Hindu Sociology.** The Panini office, (Allahabad) 1937.

৪। Sarkar B. K. **Villages and Towns as social Patterns** Calcutta Chuckerburtty, Chatterjee & Co. 1949.

১৫.৩ ধূর্জটি প্রসাদ মুখার্জী (১৮৯৪-১৯৬২)

প্রস্তাবনা :

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পরেই অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে যৌথভাবে পঠন পাঠনের জন্য নূতন একটি বিভাগ খোলে। এবং এই বিভাগের অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখার্জী ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য এবং জনপ্রিয়। আর তাঁর অনুরাগীদের কাছে তিনি ডি.পি. নামে বেশী আদৃত ছিলেন। ধূর্জটি প্রসাদ বা ডি.পি. সারা জীবন ভারতীয় ঐতিহ্য (tradition)-এর মধ্যে ভারতীয় জীবনধারা কিভাবে বিধৃত হয়ে আছে তার অনুসন্ধান যেমন করেছেন তেমনই একই সঙ্গে দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে আধুনিকতা (modernity) এবং ঐতিহ্য (tradition) পরস্পরকে ঋদ্ধ করতে পারে। তিনি প্রধানতঃ অর্থনীতির লোক হলেও ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান নীতিবিজ্ঞান (ethics) এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। বস্তুতঃ মানবজীবন ও সমাজের সামগ্রিক বোধ গড়ে তুলতেই তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই তিনি বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলি পৃথকীকরণ (compartmentalization) সেই বিষয়গুলির উন্নতিতে বাধা দেবে বলেই মনে করতেন এবং তিনি এই ধরনের পৃথকীকরণের বিরোধিতা করেছেন।

ধূর্জটি প্রসাদ এর চিন্তাধারার মুখ্য জায়গা ছিল কল্যাণভিত্তিক উন্নয়ন বা (development with welfare)। এবং তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে এই উন্নয়ন কিভাবে হতে পারে তার পদ্ধতি খুঁজতে চেয়েছেন। অনেকে তাঁকে মার্ক্সবাদী (Marxologist) বলে মনে করলেও তিনি স্বয়ং নিজেকে মার্ক্সতাত্ত্বিক (?) বলে মনে করতেন। অর্থাৎ তিনি মার্ক্স এর দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষের জন্য যদিও নিজেকে তিনি মার্ক্সবাদের রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে চাননি। এই এককটি পড়ে আপনারা ধূর্জটি প্রসাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

১) ধূর্জটি প্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী

২) সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং সমাজবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি বিষয়ে ডি.পি.র ধারণা, মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ ও ভারতীয় সমাজ পরিস্থিতির সাযুজ্য

৩) ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ডি.পি.র ধারণা

৪) ঐতিহ্য-এর অর্থ এবং তার গতিশীলতা

৪.৩.১ ধূর্জটি প্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী

১৮৯৪ সালে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ধূর্জটি প্রসাদের জন্ম হয়। তাঁর বাড়ীতে সংস্কৃত চর্চার একটি আবহ সবসময়েই ছিল এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁর সমস্ত লেখাতে ভারতীয় এবং ঐতিহ্য-এর প্রতি এক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশী যে ঘটনা রেখাপাত করে গেছে তা হল পোর্ট আর্থার-এ জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয়। যার গূঢ়তর অর্থ ছিল যে পূর্ব-এশিয়া শক্তিশালী হতে পারে এবং পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। ভারতবর্ষও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির শিক্ষালাভ করে একদিন বৃটিশদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে।

ডি.পি. প্রথমে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে বিজ্ঞান পড়া শুরু করলেও কিছুদিনের মধ্যে বিজ্ঞানের পড়াশুনা

তাঁর কাছে অত্যন্ত যান্ত্রিক বলে বোধ হয়। এবং ধূর্জটিপ্রসাদ আরও বিস্তৃত ও পরিব্যপ্ত জ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য প্রথমে ইতিহাস ও পরে অর্থনীতি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন।

১৯২২ সালে ডি.পি. লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি রাধাকমল মুখার্জির সহকর্মী ছিলেন। ধূর্জটি প্রসাদ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বহুমুখী অনুরাগ ও প্রতিভা এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণধর্মী (analytic) চিন্তাধারা দিয়ে অগণিত ভক্ত সহকর্মী এবং ছাত্রদের মোহিত করে রেখেছিলেন। ধূর্জটি প্রসাদ সবশুদ্ধ ১৯টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার মধ্যে ১০টি বাংলায় লেখা এবং ৯টি ইংরাজীতে রচিত। তাঁর Introduction to the Indian Music (1943) ভারতীয় সঙ্গীত জগতের বিশ্লেষণ ভিত্তিক একটি অসামান্য সৃষ্টি যাতে দেখানো হয়েছে যে ভারতীয় সঙ্গীত সঙ্গীত হিসাবে কিছু ধ্বনির এক বিন্যাস এবং ভারতীয় হিসাবে পরম্পরা বা ইতিহাসের একটি সৃষ্টি ("Indian Music, being music, is just an arrangement of sounds, being Indian, it is certainly a product of Indian history.")।

ধূর্জটি প্রসাদের সঙ্গীতের উপর সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক এই কাজটি মাক্স হেবারের Social and Rational Foundations of Music এর সঙ্গে তুলনীয়।

পেশাগত জীবনে ধূর্জটি প্রসাদের উন্নতি যথেষ্ট বিলম্বিত হলেও এ বিষয়ে তাঁর নিজের কোনও ক্ষোভ বা অনুযোগ ছিল না। তিনি ১৯৫১ সালে তাঁর চাকুরীতে যোগাদনের প্রায় ২৯ বছর পরে প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান পদ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানান হয়। আলিগড়ে পাঁচ বছর থাকার পর তিনি হেগ-এর International Institute of social studies এর ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন।

ভারতবর্ষের সমাজ বিজ্ঞান সভা (Indian Sociological Society) র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (foundermember) এবং প্রথম সভাপতি ছিলেন। আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সভা (International Sociological Society) তে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং উক্ত সভার উপসভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের যুক্তরাজ্যে (United Provinces) কংগ্রেস ক্ষমতাসীন থাকাকালে খুব অল্প সময়ের জন্য তিনি প্রাদেশিক সরকারের যোগাযোগ অধিকর্তা (Director of Information) নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি উত্তর প্রদেশের শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি (Labour inquiry Committee)র সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালে ৬৮ বছর বয়সে গলা কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

৪.৩.২ সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও সমাজবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি বিষয়ে ডি.পি.র ধারণা, মার্ক্সবাদ ও ভারতীয় সমাজ পরিস্থিতির সাযুজ্য বিশ্লেষণ

ধূর্জটি প্রসাদ অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের চর্চা করলেও তিনি অর্থনীতির জ্ঞানচর্চা নিয়েই সমাজবিজ্ঞানে আসেন। এই কারণে অর্থনীতিবিদগণ কিভাবে তাঁদের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা ও গবেষণা করছেন সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে অর্থনীতিবিদগণ পশ্চিমী কিছু অত্যাধুনিক কলাকৌশল (sophisticated Techniques) এবং বিমূর্ত বিবৃতি, যা কিনা খুব অল্প সংখ্যক দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে টানা হয়েছে (abstract generalization), রপ্ত করে সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক প্রগতি পর্যালোচনা করেন। ফলে ভারতীয় অর্থনীতির ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক বিন্যাস তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং এই অর্থনীতিবিদ্‌গণ বিদেশী বিশেষতঃ পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মনে করেন ভারতীয় অর্থনীতি অত্যন্ত দুর্বল এবং

পশ্চাদপদ। ডি.পি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল গৌষ্ঠীগুলি ভারতের উন্নয়নের জন্য যে ধরণের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা পোষণ করছেন বা যেভাবে এই চিন্তাধারা কার্যে পরিণত করছেন তা অত্যন্ত দুর্বল। এর কারণ এই গোষ্ঠীগুলির ভারতবর্ষের সামাজিক ও বাস্তব পরিস্থিতি (social reality) সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও সাধারণ সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা (of their ignorance of and unrootedness in India social reality)।

ভারতীয় সামাজিক ও বাস্তব পরিস্থিতির বহু বিভিন্ন দিক (many and different aspects) আছে এবং তার একটি নিজস্ব ঐতিহ্যও আছে যা আবার তার ভবিষ্যৎ (future) নির্ধারণ করে। এই সামাজিক ও বাস্তব পরিস্থিতিকে বুঝতে গেলে প্রয়োজন ১) এর বিভিন্ন দিকের মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং ২) এর ঐতিহ্য ও যে শক্তিগুলি একে পরিবর্ত্তিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয় তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সমন্বিত এবং সাংক্ষেপিক জ্ঞান (Comprehensive and synoptic knowledge)। এবং ধূর্জটি প্রসাদ মনে করতেন যে এখানে সমাজবিজ্ঞানের এক বিশেষ অবদান আছে। কারণ সমাজবিজ্ঞান এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যার একটি কাঠামো বা ডি.পি. ভাষায় মেঝে এবং ছাদ আছে (Sociology has a floor and a ceiling like any other discipline)। কিন্তু অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞানের ছাদ বা মেঝে কোনোটিই কিন্তু বাঁধাধরা গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয় সমাজবিজ্ঞানের মেঝে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের উৎসস্থল বা সংযোস্থল আর সমাজবিজ্ঞানে ছাদ আকাশ পর্যন্ত উন্মুক্ত (The speciallity of sociology 'consists in its floor being the ground floor of all types of social disciplines and its ceiling remaining open to the sky'')।

অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটাতে পারে বা প্রত্যেকটি সামাজিক বিজ্ঞান একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ডি.পি. বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষীকরণের (specializations) নামে পৃথকীকরণের (compartmentalizations) তীব্র সমালোচনা করতেন। এই পৃথকীকরণের ফলে তিনি মনে করতেন অর্থনীতি কতগুলি শুষ্ক বিমূর্ত ধারণা ছাড়া কিছুই দেখায় না এবং এ ধারণাগুলির সঙ্গে ভারতীয় জীবনধারার যোগ এতই ক্ষীণ বা দুর্বল যে তা নেই বললেই চলে। যার ফলে ভারতবর্ষে এগুলির প্রয়োগও অর্থহীন। আর অন্যদিকে নৃবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা (narrow empirical research) র উপর নির্ভরশীল যে এই সামাজিক বিজ্ঞানগুলি ভারতবর্ষে সাধারণ বা সার্বিক কোনও ছবি দিতে অক্ষম। ধূর্জটি প্রসাদ মনে করতেন সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের এই অসুবিধা দূর করে ভারতীয় সমাজের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে পারবে।

ধূর্জটি প্রসাদ সেই কারণে মনে করতেন যে সমাজ বিজ্ঞানের প্রথম কাজ হবে সেই সূত্রগুলিকে বা ব্যক্তিগুলিকে বোঝা যা বিশেষ একটি সমাজকে বহু সময় ধরে গ্রথিত করে রাখে বা টিঁকিয়ে রাখে। ধূর্জটি প্রসাদ মনে করতেন যে ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানীদের ভারতীয় ঐতিহ্য (Indian tradition) সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার কারণ এই ঐতিহ্য ভারতীয় সমাজকে এত সহস্র বছর ধরে একসঙ্গে ধরে রেখেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সমাজবিজ্ঞানে শুধু স্থিতাবস্থা (statusquo)র উপর জোর দেননি, দিনি বলেছিলেন যে সমাজবিজ্ঞানকেই সামাজিক পরিবর্ত্তনের পন্থা খুঁজে বার করতে হবে এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে (''Sociology should ultimately show the way out of the social system by analysing the processes of transformation'')।

বস্তুতঃ ধূর্জটি প্রসাদ তাঁর সমাজবিজ্ঞানে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে সমাজ কিভাবে কোনও বড় মাপের বিখণ্ডায়ন (disintegration) না ঘটিয়ে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আর সেই কারণেই তিনি মনে করেন যে ভারতীয় সমাজকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞান কে চিরাচরিত পশ্চিমী ধাঁচে বা পদ্ধতিতে চললে চলবেনা। সমাজবিজ্ঞানকে আগে ভারতের ঐতিহ্য (tradition) কে এবং এর বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি ও সামাজিক কার্যকলাপ (special patterns of calture and social action) কে। সেই কারণেই ডি.পি. বলেছেন, ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীকে শুধু সমাজবিজ্ঞানী হলেই চলবে না, তাঁকে হতে হবে ভারতীয়। অর্থাৎ তাঁকে ভারতীয় লোকাচার (flokways), লোকনীতি (mores) প্রথা (customs) এবং ঐতিহ্য বা পরম্পরা (tradition) সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হতে হবে। আর সেই কারণেই ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানীকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মেলবন্ধন ঘটাতে হবে ১) প্রথমতঃ ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীকে একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী (comparative approach) গ্রহণ করতে হবে। একটি প্রকৃত তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় সমাজের সঙ্গে অন্যান্য সমাজের মিল কোথায় আছে তা যেমন দেখাবে, সেইরকম একই সঙ্গে দেখাবে ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি-কে। সেই কারণেই, সমাজবিজ্ঞানীদের প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে যে তিনি যে সমাজটি বিশ্লেষণ করছেন সেই সমাজে-র এতিহ্য সেই সমাজের সদস্যদের কাছে কতটা এবং কীভাবে অর্থবহ।

২) ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীকে একই সঙ্গে একটি দ্বান্দিকতামূলক দৃষ্টিভঙ্গীও গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় সমাজের সমন্বয় এবং বিচ্ছিন্নতা (synthesis and conflict) কে বুঝতে পারবেন ; কারণ ভাতীয় সমাজে এক দিকে যেমন পরিবর্ত্তন দৃশ্যমান আর একদিকে সংরক্ষণশীলতাও (conservation) সমানভাবে কার্যকরী।

মার্ক্সবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্য

মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে ধূর্জটি প্রসাদের এক বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ডি.পি. মনে করতেন মার্ক্সবাদ এক কাঙ্ক্ষিত উচ্চমানের সমাজ তৈরীর কৌশল শেখায়। সেই উচ্চমানের সমাজ এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল যেখানে ব্যক্তিসত্ত্বা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিসত্ত্বার সঙ্গে পরিকল্পিত ভাবে মিলিত হয়ে একটি সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। সেই সামাজিক উদ্দেশ্য হল সমাজবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে কোনও ধরণের শ্রেণী বিভাজন থাকবেনা। ডি.পি.-র সমসাময়িক কালে কিছু মার্ক্সবাদী পণ্ডিত ভারতবর্ষে দ্রুত বা রাতারাতি সমাজবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সামাজিক পরিবর্ত্তনের কথা ভাবছিলেন। ধূর্জটি প্রসাদের কিন্তু মনে হয়েছিল যে এই পরিবর্ত্তন উপযোগী নয়। এর জন্য তিনি তিনটি কারণ দেখিয়েছিলেন— ১) মার্ক্সবাদীরা প্রত্যেকটি সামাজিক ঘটনা বিশেষ করে সামাজিক পরিবর্ত্তন শ্রেণী সংগ্রাম (class conflict) এর মাধ্যমে সংঘটিত হয় বলে মনে করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন জাতি ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা প্রসূত সামাজিক রীতিনীতি প্রচলিত থাকার ফলে কোনও শ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে কোনও সুস্পষ্ট শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজ বস্তুও ভারতবর্ষে অনুপস্থিত। ২) দ্বিতীয়তঃ, যে পণ্ডিতবর্গ ভারতবর্ষে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বন্দ্বকে ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতবর্ষে পরিবর্ত্তন সাধন করবেন বলে মনে করতেন, ধূর্জটি প্রসাদের মতে, তাঁরা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ভিত্তিক সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত। ৩) তৃতীয়তঃ ধূর্জটি প্রসাদ দেখালেন যে অর্থনৈতিক প্রভাব বা চাপ (pressure) কিন্তু কখনই কোনও জড় বা মৃত বিষয়কে পরিবর্ত্তন করেনা, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তো নয়ই। কারণ ভারতীয় ঐতিহ্যের এক প্রচণ্ড প্রতিরোধ (resistance) ক্ষমতা আছে। এই প্রতিরোধ ক্ষমতাকে মোকাবিলা করতে পারে একমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা (mode of production)-র পরিবর্ত্তন।